পৃথিবী নয়
সূর্য ঘোরে
মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে

[NOT THE EARTH BUT THE SUN MOVES]

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বি. এস্-সি., বি. সি.
এস. (Engg-Telecom), এণ্ড টি. এস.
জাপান, এ. বি. কে. টোকিও,
প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাপ্ত, বিজ্ঞান
না কোরআন ? বৈজ্ঞানিক
মুহাম্মদ (দঃ) সিরিজ,
জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)
প্রভৃতি আলোড়ন সৃষ্টি-
কারী গ্রন্থ প্রণেতা ।

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট. কলিকাতা-৭৩

Library of Congress America Cataloging in Publication Data.
PRITHIBI NAY SURJA GHORE
[Not the Earth but the Sun moves]
Written by—
MD. NURAL ISLAM, B. Sc.
B. C. S. Engg-Telecom.

প্রকাশক :
আলহাজ্ব আব্দুর রহমান মল্লিক
১১০/এ, এম. জি. রোড
কোলকাতা-৭০০ ০০৫

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

প্রথম ভারতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৯৩
তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৯৭
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৮
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, ২০১৬

ISBN : 81-7999-015-X

মুদ্রণে
দি নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের লিখিত "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" বইটি তাঁর অনুমতিতে আমরা প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। লেখক বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্র এবং কোরআন-হাদিস, বেদ-বেদান্ত, জিন্দাবেস্তা ও বাইবেল পাশাপাশি রেখেই প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কোরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের সূত্রকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ দিয়েছেন যে পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। আশা করি, বাংলাদেশ ও ভারতের অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এই বইটি পাঠ করে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তালার মহান সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করতে এবং নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। "তোমরা কি দেখছ না যে আল্লাহ রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রবিষ্ট করে থাকেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন এবং প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে থাকে এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।"

২১ পারা—৩১ ঃ ২৯ ॥ সূরা লোকমান

[আল-কোরআন]

[প্রকাশক]

চ্যালেঞ্জ

আমি এই মর্মে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি যে যদি কেউ কোরআন-হাদিস, বেদ-বাইবেল, জিন্দাবেস্তা-উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হতে একটি মাত্র বাক্য, —'পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে,' অথবা দুটি মাত্র শব্দ—'পৃথিবী ঘোরে' আমাকে দেখাতে পারেন তা'হলে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।

[লেখক]

পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে

[NOT THE EARTH BUT THE SUN MOVES]

"The Scientific theories of today differ greatly from those of a century ago. No one doubts that the theories of a century hence are likely to differ greatly from those of today. How then can we put faith in any of them."

[Belief and Action,
Viscount Samuel—Page 25]

(বর্তমানের বৈজ্ঞানিক মতবাদ একশ বছর পূর্বের মতবাদের সঙ্গে মেলে না। এখন থেকে একশ বছর পর আবার যা বলা হবে তা নিঃসন্দেহেই মিলবে না। তাহলে কিভাবে আমরা এর একটা প্রমাণের উপরও আস্থা আনতে পারি।)

"অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের কথা মানিও না—
বরং কোরআনের বলে শক্তিশালী হইয়া সংগ্রাম কর।"

[সূরা ফোরকান]

বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম

দু'টি কথা

শ্রদ্ধাশীল গুরুজন ও প্রিয় ভাইবোনেরা। জটিল এক সমস্যার উপর হাত বাড়িয়েছি। এ সমস্যা আমার নয়। সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গুরুতর সমস্যা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সমস্যা চলে আসছে এবং যে সমস্যা সমাধানের পথে বহু বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদ আত্মনিয়োগ করেছেন সে সমস্যার সমাধান আমার মত একজন অতি নগণ্য ব্যক্তির করা দুরূহ। তাই এ কথা আমি জোর করে বলতে চাই না যে এরূপ গুরুতর সমস্যা আমি সমাধান করলাম এবং এটাই শেষ সমাধান। কেন আমার মাথায় এমন খেয়াল চাপল সেই কয়টা কথা বলেই আপনাদের শোনাব।

জানি আজ আমি আপনাদেরকে যে কথা শোনাতে যাচ্ছি সেটা হয়ত আপনাদের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। তবু না লিখে থাকতে পারছি না, কেননা ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যাস সত্যের পথে চলা, সত্যকে আকড়িয়ে ধরা ও সত্যের পথে দু'এক কলম লেখা।

সত্য অথবা অসত্য যেটাকে ধরেই চলা যায় না কেন সেটাই মহাসত্য বলে মনে হয়। এতটুকু বিশ্বাস নিয়ে চলে বলেই মানুষ টিকে থাকে, নতুবা আত্মদ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত হয়ে সবাই ধরা হতে বিদায় নিত। ইসলাম মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করে এবং এর সারবত্তাকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে কিন্তু মূর্তিপূজক একে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই বিশ্বাস করে এবং এর মধ্যেই তার ত্রাণকর্তার উপস্থিতি খুঁজে পায়। এইরূপ বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন বিশ্বাসের উপর সামাজিক জীবন গড়ে তোলে ও জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করে। প্রকৃত সত্য আলেমুল গায়েব আল্লাহই জানেন। তাঁর নির্দেশিত পথই অভ্রান্ত, সরল ও সুপথ। একথা শুধু মুসলমানই নয়, প্রতিটি মানবজাতিই স্বীকার করে। যখন একথাই সবাই স্বীকার

করে তখন তাঁর নির্দেশিত পথ একমাত্র কোরআনকে অস্বীকার করবার কোন যুক্তিই কোন গোত্রের থাকতে পারে না। তাই চলুন আল্লাহর মহাবাণী কোরআনকে সম্মুখে রেখে জটিল সমস্যার সমাধানের পথে আমরা বিভিন্ন গোত্র ও জাতি একসাথে অগ্রসর হই।

ধর্মের প্রতি মন, ঈমান ও বিশ্বাস আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল কিন্তু ছিল না কৃষ্টি সাধনা ও জ্ঞান। এজন্য আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নই। প্রথম শ্রেণী হতে আরম্ভ করে ডিগ্রী ক্লাশ পর্যন্ত কোথাও ধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি। যখন স্কুলে পড়েছি তখন বুঝবার ক্ষমতা ছিল নিতান্তই অল্প। যতটুকু আরবী পড়েছি ও কোরআনের ব্যাখ্যা পেয়েছি ততটুকু পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন মনে করেই গলাধঃকরণ করেছি। এরপর বিজ্ঞান নিয়ে যখন কলেজে অধ্যয়ন করি তখন গ্যালিলিও, নিউটন, ফ্যারাডে, ডাল্টন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের থিওরী এমনিভাবে মাথায় চেপে বসল যে কোরআনের মহাবাণী বিশ্লেষণ করার অবকাশই থাকল না। যাই হোক, কোন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য একটা ডিগ্রী নিয়ে সংসার সংগ্রামে ব্রতী হলাম।

১৯৬১ সনের শেষের দিকে এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েও নিবিষ্টমনে ধর্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করবার কিছুটা অবকাশ পেলাম। "সূরা ইয়াছিন" পড়ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেখলাম চতুর্থ রুকুতে ৩৮, ৩৯, ৪০ আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "**সূর্য তাহার আপন কক্ষের উপর পরিক্রমণ করিতেছে। ইহাও সেই মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর মহাবিধান।**" হঠাৎ যেন কয়েক শতাব্দীর চাপা ভ্রম আমার ভাঙল। **সূর্য স্থির** এ মহা অসত্যতার মাথায় কুঠারাঘাত করতেই আমার হৃদয় সাড়া দিল। তারপর অতি নিবিষ্ট মনে কোরআন পড়তে আরম্ভ করলাম। সূরা রহমান, সূরা জোমর, সূরা রাদ, সূরা নহল, সূরা লোকমান, সূরা রুম প্রভৃতি সূরা পেয়ে গভীরভাবে একের পর এক চিন্তা করতে লাগলাম; বহুদিন

চিন্তার পর আমি উক্ত মহাবাণীগুলো ব্যাখ্যা করে যা বুঝতে পেরেছি তাই সন্নিবেশিত করেছি। তারপর ইসলাম গবেষণাবিদ কয়েকজন পন্ডিতকে আমার ব্যাখ্যা দেখিয়েছি। তাঁদের মধ্যে জামিয়া ইমদাদিয়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব অন্যতম। আরবী ভাষায় আমি ব্যুৎপত্তিশীল নই। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষাভাষী পন্ডিত ব্যক্তিদের অনুবাদ ও মতামত যা বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সারাংশ নিয়েই এ কাজে অগ্রসর হই। আমার আলোচনায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ইসলামিক চিন্তাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিদের অনুরোধ করব তাঁদের মতামত পাঠাতে, যেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিতে পারি।

বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের আলোচনাতেই আমরা আনন্দ পাই। ধর্মের কথা শুনতে মন চায় না। তাছাড়া অমুসলমান ভাইয়েরাই বা কেন আমাদের মূল মন্ত্রের কথায় বিশ্বাস করবে। দেখলাম বিরাট সমস্যা। তবুও এ সমস্যা সমাধানের পথে আমাকে পা বাড়াতেই হবে। কিন্তু কঠিন, বড় দুর্বোধ্য এ বাধা লঙ্ঘন করা। তবুও মন বলল এবং সাড়া দিল বিজ্ঞানের পথ ধরে এ পথে চিন্তা করতে ও এর সুষ্ঠু সমাধান করে কোরআন ও বিজ্ঞান পাশাপাশি রেখে সমগ্র মানব জাতির ভ্রম ভাঙাতে। নিউটনের মহাসূত্র ধরেই এ চিন্তা আরম্ভ করলাম। **"বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই একে অপরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভর ও পরোক্ষভাবে দূরত্বের উপর।"** পৃথিবী ও সূর্য সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখতে পেলাম পৃথিবীর ভর সূর্যের চাইতে বেশী। তাই পৃথিবী সূর্যকে তার চতুর্দিকে ঘোরাবে। এরপর Electronic Theory, ধ্রুব নক্ষত্র, মহাশূন্য, বায়ুমণ্ডলীর গতি প্রভৃতি একের পর এক চিন্তা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেগুলো ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করেছি। প্রথমত ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কারো কাছেই প্রকাশ করতে সাহস

পাইনি। অনেকে সাহস দিয়েছে, অনেকে অট্টহাস্যে উড়িয়ে দিয়েছে। মন আমার বাধা মানল না। বন্ধু-বান্ধবের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আমার মনের স্রোতের কাছে হার মানল। ইচ্ছে হতে লাগল খবরের কাগজ মারফত প্রিয় ভাই-বোনদের কাছে তুলে ধরতে; স্থান পেলাম না। খ্যাতনামা কয়েকটা খবরের কাগজের দরজা হতে বিফল হয়ে ফিরতে হলো। শেষে জনগণের অতি অপরিচিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী "**জাহানে নও**" পত্রিকার সম্পাদক **জনাব তালিব** সাহেবকে দেখালাম। বিশেষ হৃদয়বান হয়েই তিনি আমার প্রবন্ধটি হাতে নিলেন এবং তাঁর কাগজে নিজের উপর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েও "**বিতর্কিকা**" নাম দিয়ে একটা পরিচ্ছেদ আমার জন্য খুললেন এবং চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী লোকদের সমালোচনার জন্য আহ্বান জানালেন। বাংলা ১৩৭৩ সনের ২৫শে আষাঢ় সংখ্যায় আমার "**পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে**" প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করল। প্রকাশনার ব্যাপারে সহ-সম্পাদক জনাব সালেহ উদ্দিন সাহেব আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। দু'সপ্তাহ পর আলোচনা শুরু হলো। প্রথম তিন সপ্তাহ প্রবন্ধের বিরোধিতা করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন জনাব হাবিবুর রহমান ভুঞা, জনাব সৈয়দ আফছার উদ্দিন ও জনাব নূর মোহাম্মদ। তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আমি জানি না। তাঁদের জবাব আমি ধারাবাহিক রূপে কাগজের মাধ্যমেই পেশ করতে লাগলাম। এরপর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে দেখলাম আমার স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে তাঁদের জবাবগুলোর উত্তর দিয়েছেন জনাব আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম খান, জনাব আব্দুল হাই ছুলফী ও জনাব আবু জাফর সিদ্দিকী। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় তাঁরা যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে আমার কথাগুলোর সারবত্তা প্রমাণ করেছেন তার জন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি কারো সঙ্গেই পরিচিত নই। কারো ঠিকানা, শিক্ষাগত মর্যাদা ও গুণাগুণের কথাও আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি।

প্রায় তিন মাস যাবৎ আমার প্রবন্ধ আলোচিত হবার পর এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সহ-সম্পাদক জনাব সালেহ উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ও চিন্তাশীল মনীষীরা আমার প্রবন্ধের আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবিরাম বারিপাতের ফলে "জাহানে নও" অফিস ও প্রেসের ক্ষতি হয়। তাই সম্পূর্ণ লেখাগুলো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে আলোচনার ইতি হয়। অবশ্য এর মাঝেও একটু ফাঁক আছে। কেননা কাগজের মাধ্যমে আলোচনাকারীদের অনুরোধ করলে আবার ফিরে পাওয়া যেত। কিন্তু নতুন সম্পাদক **জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের** কথায় জানলাম যে মানুষ বিজ্ঞানের আলোচনাকে আজকাল পছন্দ করে না। বিজ্ঞানের যুগে হাওয়ায় ঘুরতে নাকি বেশ ভয় হয়। তাই নতুন নতুন আজগুবি গল্প, সংবাদ ও প্রবন্ধেরই প্রয়াসী। যাই হোক আমিও তাই সেখানেই ইতি দিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু পারলাম না স্থির হয়ে বসে থাকতে। আমার পাশেই এসে পড়লেন আমার এক বন্ধু-পাগল সহকর্মী **জনাব মেসবাহ উদ্দিন সাহেব**। তাঁর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। নিজের পরিশ্রমকে উপেক্ষা করেও তিনি আমাকে সাহায্য করলেন—বাধ্য করলেন বিশ্বের সম্মুখে আমার বক্তব্য আলোচনাসহ তুলে ধরতে।

তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সম্মুখে তুলে ধরবার মনস্থ করেই আমি আমার লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি। অনুবাদের ব্যাপারে আমি হৃদয় থেকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কিশোরগঞ্জ কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ পণ্ডিত জনাব রফিকুর রহমান চৌধুরী সাহেবের কাছে। তাঁর সুমধুর ব্যবহার, মধুর আপ্যায়ন ও অনুপ্রেরণা আমাকে শুধু আনন্দই দেয়নি, আমার প্রাণে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছে। তাঁর কাছে যে সাহস ও আশা-ভরসা পেয়েছি তা হয়ত অনেক দিন

পর্যন্ত আমার মনের খোরাক যোগাবে। অতি যত্ন সহকারে তিনি আমার ইংরেজির অনুবাদ দেখেছেন, শুদ্ধ করেছেন এবং নিজ হাতে কোরআনের সংশ্লিষ্ট বাণীগুলি ব্যাখ্যাসহ ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন।

ঢাকার সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা "YOUNG PAKISTAN" মারফত উক্ত অনুবাদটি ১৯৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পৃথিবীর ৭০টা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন বিভিন্ন পত্রিকায় এর উপর আলোচনা চলতে থাকে তখন ছাত্র-শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের একান্ত ইচ্ছায় ১৯৬৮ সনে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। ১৯৭০ সনের মে মাসে আমার রচিত '**বিজ্ঞান না কোরআন ?**' বইটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস'—আমেরিকা কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশের উন্নত পাঠাগারসমূহে স্থান লাভ করায় এ বইখানির চাহিদাও বেড়ে চলে। তাই পর পর সংস্করণ দিতে হয়। দেরীতে হলেও এ '**পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে**'—বইখানি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনজরে আসল আর ক্ষুদ্র চিন্তাবিদ এ বাঙালি লেখকের নামটি বিশ্ব-মনীষীদের পাশে তাঁদের ক্যাটালগে স্থান পেল। আর বিবিসি (লন্ডন) থেকে চারজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার নামটিও ঘোষিত হলো প্রথম চিন্তাবিদ হিসাবে। এ কৃতিত্ব আমার নয়, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনদের। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার প্রিয় বন্ধু জনাব আব্দুল হামিদ সাহেবকে (সহকারী ইঞ্জিনিয়ার টি এন্ড টি) যিনি দুই যুগ আগে আমার হাতে একটি মূল্যবান কলম উপহার দিয়ে এই বলে বিদায় দিলেন—"**আপনার লিখনী চিন্তাজগতে বিপ্লব আনুক।**"

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি আমার এ চিন্তাধারাটি তাঁদের ধর্ম পুস্তক হতে চূড়ান্তভাবে বিচার করুক এবং দেখুক কোরআন ও হাদিসের কথাগুলো কেমন চিরন্তন সত্য, এ উদ্দেশ্যেই বেদ, বাইবেল ও জিন্দাবেস্তা হতেও উক্ত বিষয়ের উপর উদ্ধৃতি পেশ

করলাম। এছাড়া ভৌগোলিক প্রমাণে বিষয়টির সারবত্তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, বিপ্লবী ভাই-বোনেরা সত্য অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন।

ভুল মার্জনীয়। গুরুজনদের আশীর্বাদ, বন্ধু-বান্ধবদের শুভেচ্ছা আর জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাপসদের সুদৃষ্টি একান্তভাবে কামনা করি। খোদা হাফেজ।

—লেখক

ADDRESS :

Present :

MD. NURAL ISLAM, B.Sc.,
B. C. S. (Engg-Telecom)
Sub-Divitional Engineer,
Microwave Station, Banani
P. O. & Dist.—Bogra
Bangladesh

Permanent :

MD. NURAL ISLAM, B. Sc.,
C/O MD. Nazib Uddin Sarker
Vill.—Marichtala
P. O.—New-Sariakandi
Dist.—Bogra
Bangladesh

সূচীপত্র

[কোরআন ও বিজ্ঞানের প্রমাণ ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত]

কেনর জবাব ?

[পৃথিবীর গতি]

কেনর জবাব পাব কোথায় কে শিখাবে মোরে ।
জটিল প্রশ্ন আসে আমার মাথায় বারে বারে ॥
পৃথিবীর দুটি গতি বৈজ্ঞানিকরা বলে ।
কেমনে তবে জীবজন্তু ধরার বুকে চলে ?
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে ওজন আছে যার ।
সেইত নিবে কাছে টেনে হোক্ না যত আকার ॥
আগুনের ওজন আছে কে বলিতে পারে ।
কেমনে তবে ঘুরায় রবি ভারি পৃথিবীরে ?
দুটি বস্তু চুম্বক হলে তবেই কেবল টানে ।
অগ্নিপিণ্ডের সেই শক্তি নাই যে সবাই জানে ॥
কেমনে তবে বসুন্ধরা ঘোরে সূর্যের পিছে ?
বিজ্ঞানীদের যুক্তি তবে হয় নাকি মিছে ॥
উড়োজাহাজ নিয়ে যদি অভিযান চলে ।
দেখবে তখন ধরার বুক কিছু নাহি দোলে ॥
পুবাল হাওয়া কেমনে তবে উল্টা দিকে যায় ?
হাজার মাইল গতি যেথা পশ্চিম থেকে ধায় ॥
গতিই যদি থাকবে তবে কেন সাগর জল ।
ডুবায় না'ত সৃষ্টি যত করে না'ত তল ॥
দুই দিকেতে ছুঁড়লে গুলি সমান দূরে যায় ।
বল তবে থাকলে গতি কেমনে এমন হয় ?
ধ্রুব তারা থাকে কেন উত্তর আকাশ ধরে ।
ঘুরত যদি এই পৃথিবী যেত নাকি সরে ?
এসব কেনর জবাব কিন্তু আজও মিলে নাই ।
তাইতো আমি এই পৃথিবী স্থির বলে যাই ॥

[লেখক]

কোরআনের প্রমাণ

"বল সত্য এসেছে, অসত্য বিদূরিত হয়েছে।
যথার্থ ই অসত্য বিলুপ্তকারী"

[কুরআন মজিদ]

[বিছমিল্লাহির রহমানের রহিম]

জটিল প্রশ্নের সমাধান মহাগ্রন্হ কোরআনের বাণী হতেই করা যায়। আমিও আজ তাই পবিত্র কোরআনের সাহায্য নিয়েই একথা দৃঢ় কণ্ঠে ও পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, গ্যালিলিও সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন সেটা ভ্রমাত্মক। তবে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন সেগুলো আংশিক সত্য। কোরআন আল্লাহর বাণী, তাই নির্ভুল এবং নির্ভেজাল। শুধু মুসলমানই নয়, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা অন্তত কোরআনের বাণীকে অবিশ্বাস করবে না। চোদ্দশ বছর পূর্বে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার একটা শব্দও যেখানে ভুল বা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়নি এবং যে কোরআনের সাথে একটা শব্দও যোগ বা বিয়োগ করবার প্রয়োজন কোন জ্ঞানী বিধর্মী বা পন্ডিতগণও মনে করতে পারেননি সেই কোরআনের বাণীকে কোন জ্ঞানীলোক অবিশ্বাস করবে বলে আমি মনে করি না। আর করবার যুক্তিযুক্ত কারণই বা কোথায়? এটা কবির কবিতাছন্দ নয়, বৈজ্ঞানিকের থিওরী নয়, পাগলের প্রলাপ নয়, লেখকের উপন্যাস নয়, মহাপুরুষের মনগড়া কথা নয়, জ্ঞানীর উপদেশ বাণীও নয়। এটা সেই মহামহিমান্বিত মহাজ্ঞানীর মহাবাণী যা ছন্দে ও রূপে, ভাষায় ও ভাবে, জ্ঞানে ও সাধনায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, আদেশে ও উপদেশে পরিপূর্ণ জিবন-ইনসানের আলোকচ্ছটা মহাগ্রন্হ। তাই কে তাকে অবিশ্বাস করবে? (নাউজুবিল্লা) আজ আমি তাই পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই কোরআনের বাণী উদ্ধৃত করে সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করছি।

চন্দ্র ও সূর্য ঘুরছে

সূরা ইয়াছিন (৩৬ : ৩৮-৪০)
[আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০]

"ওয়াশ্ শামছু তাজ্রী লিমুস্তাকাররে[১] ল্লাহা জালেকা তাক্দিরুল আজিজিল আলীম। ওয়ালকামারা কাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদাকাল উরজুনিল কাদিম। লাশ-শামছু ইয়াম্বাগি লা-হা আন তুদরিকাল কামারা ওয়াল্লায়লু সাবিকুন্নাহার ; ওয়া কুল্লুন[২] ফিফালাকে ইয়াছবাহুন।" অর্থাৎ—

৩৮। "এবং সূর্য তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমণ করিতেছে। ইহাও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর মহাবিধান।"

৩৯। "এবং আমি চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি—যে পর্যন্ত উহা পুরাতন খর্জুর শাখার ন্যায় পুনরাবর্তিত না হয়।"

৪০। "সূর্যের এমন সাধ্য নাই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে অথবা রজনী দিবসকে অতিক্রম করিবে **এবং উহারা প্রত্যেকেই নভোমণ্ডলের মধ্যে পরিক্রমণ করিতেছে।**"

উপরের উদ্ধৃত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝানো যাচ্ছে যে সূর্যের জন্য নির্দিষ্ট এক চক্র আছে যার উপর প্রতিনিয়ত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তা সৃষ্টির পর থেকে পরিক্রমণ করছে। এ কোনদিন কক্ষচ্যুত হয়নি এবং আল্লাহর ইচ্ছা

টীকা ১। লিমুস্তাকার : সূরা ইয়াছিনের ৩৮ আয়াতে সূর্যের গতিবিধি বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ (১) নির্দিষ্ট কক্ষে, (২) নির্দিষ্ট সময়ে ও (৩) নির্দিষ্ট সীমায়।

সূর্যের গতিবিধি এ তিনটে অর্থেই আমরা সত্য বলে দেখতে পাই। **প্রথমত,** অর্থ ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পাই যে সূর্য **নির্দিষ্ট কক্ষের** উপর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বলেই একপাশে আলো পড়ছে আর অন্য পাশ তখন অন্ধকার হচ্ছে। অর্থাৎ দিবা-রাত্রি এ সূর্য ঘূর্ণনেরই ফলাফল।

ব্যতিরেকে হবেও না। কোটি কোটি বছর চলে গেছে এই একই নিয়মের ওপর। এর ব্যতিক্রমের কথা কোন পূর্বপুরুষের ইতিহাসেও লেখা নেই। এখান থেকে পরিষ্কার **বোঝা যাচ্ছে সূর্য স্থির নয়।**

দ্বিতীয় মহাবাণী হতে দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্রের জন্য রাশিসমূহ চক্র নির্ধারিত আছে, যার উপর তা প্রতিনিয়ত ঘুরছে আর পুরাতন চক্র ছেড়ে নতুন নতুন চক্রসমূহকেই অনুসরণ করে চলেছে। আল্লাহপাক সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েই চন্দ্রের পরিক্রমণ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। খেজুরের পুরাতন শাখা যেমন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে তেমনি চন্দ্র বিভিন্ন চক্রে ঘুরে ঘুরে দিন দিন লোপ পায়। সূর্যের জন্য একটি মাত্র চক্রই নির্ধারিত হয়েছে আর চন্দ্রের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নতুন চক্র। **চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই ঘুরছে** এবং তারা একত্রিত না হয়ে নভোমণ্ডলের মধ্যেই মহাজ্ঞানীর মহা-বিধানের ওপরই চলছে। রাত যেমন দিনকে অতিক্রম করে না অথবা দিন যেমন রাত্রির অন্ধকারে প্রবেশ করে না, তেমনি চন্দ্র ও সূর্য Colision করে মহাবিপদ ঘটায় না। কি অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল!

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় যা পরবর্তী সূরাগুলোতে বারবারই বলা হয়েছে (সূরা রা'দ, সূরা ফাতের, সূরা লোকমান ইত্যাদি)। এর অর্থ সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথের ওপর আবর্তন করে পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। এর এক মিনিট সময় কম বেশী হয় না। সৃষ্টির পর থেকে এ নিয়মই তা মেনে আসছে। কোনদিন শোনা যায়নি যে এপ্রিল মাসে দিবা-রাত্রির সময় কোন কালে বিশ ঘণ্টায় হয়েছে আর বিংশ শতাব্দীতে কোন শুভ কালে তা ২৫ ঘণ্টায় হয়েছে। কোন যুগে, কোন কালে বা কোন শতাব্দীতেই সূর্যের এমন পাগলামী খেয়াল হয়নি। **তাই নির্দিষ্ট সময়ের অর্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।**

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সীমা ঃ সূর্যের ভ্রমণপথের নির্দিষ্ট সীমা কি এটা বুঝতে কারোই অসুবিধা হবে না। কেননা যাঁরা সূর্যকে স্থির বলে বিশ্বাস করেন তাঁরাও ভৌগোলিক প্রমাণে ঋতু পরিবর্তনের জন্য সূর্যের উত্তরে এবং

সূরা জোমর (৩৯ : ৫)

[আয়াত ৫]

"খালাকাস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদা বেল্ হাক্কে ; ইউকাব্বিরো-ল্লায়লা আল্লা-ন্নাহারে ওয়া ইউকাব্বিরো-ন্নাহারা আলাল্লাইলে, ওয়া সাখ্খারা শাম্ছা ওয়াল্‌ কামারা ; কুল্লুই ইয়াজ্বরিলি আজাল্লেম মুসাম্মা আলা হুয়াল্ অজিজুল গাফফার।"

অর্থাৎ—

৫। "তিনি সঠিকভাবে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি রজনীকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন এবং দিবসকে রজনী দ্বারা আবৃত করিয়া থাকেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়াছেন, সকলেই **এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিক্রমণ করিতেছে,** সতর্ক হও ! নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।"

উপরের উদ্ধৃত আয়াত থেকে এ ধারণা কি দ্বিধাহীন চিত্তে করতে পারে না যে মহাজ্ঞানী আল্লাহর অপরিসীম সৃষ্টি কৌশলের

দক্ষিণে দুটি শেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশ। এটাই হলো সূর্যের নির্দিষ্ট সীমা। উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে এই নির্দিষ্ট সীমা থাকার জন্যই এবং এর মাঝে পরিভ্রমণের জন্যই ঋতু পরিবর্তন ঘটে থাকে। কোরআনের এ অর্থটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়—সূরা ইউনুস ৫ আয়াত, সূরা রহমান ৫ আয়াত ও সূরা আনু-আম ৯৬ আয়াতে যা দেখানো হয়েছে।

টীকা ২। কুল্লুন—আরবী ভাষায় এই '**কুল্লুন**' শব্দের অর্থ সমস্তই, প্রত্যেকেই, সকলেই, উভয়েই। দ্বিবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সূরা ইয়াছিনের ৪০ আয়াতের চন্দ্র-সূর্যের প্রসঙ্গের পরই এ 'কুল্লুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মহাশূন্যের মধ্যে সমস্তই ঘুরছে এ অর্থে যারা এ 'কুল্লুন' শব্দটিকে মনে করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভুল করেছেন। কেননা মহাশূন্যে অবস্থিত সমস্ত বস্তুই ঘুরছে না—যেমন 'ধ্রুব নক্ষত্র' হেডোলির অকটেন্ট আরও অনেক। কোরআন সে কথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে ; (সূরা তকভীর ও সূরা নাহালে)। "ফা-লা উক্সিমু বিল খুন্নাসিল্ জাওয়ারিল কুন্নাস।" (সূরা তকভীর, আয়াত ৬)

ওপরই চন্দ্র ও সূর্য এক **নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘুরছে** এবং দিবস ও রজনীর পরিবর্তন সাধন করছে? যখন চন্দ্র আসে তখন সূর্য অলক্ষ্যে চলে যায়। আবার যখন সূর্য আসে তখন চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি আজ্ঞাধীন করেছেন, কেউই স্থির নয়। সবাই আল্লাহর নির্দেশ পালন করে নিজ নিজ কক্ষের ওপর ঘুরছে।

সূরা শামস (৯১ : ১-২)

[আয়াত ১ ও ২]

১। **"সাক্ষী ঐ সূর্য ও উহার রশ্মি।"**

২। **"এবং চন্দ্র যখন উহার পশ্চাদগামী হয়।"**

এখানে সূর্য ও তার রশ্মি সৃষ্টির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ক্ষমতাশীল মহান আল্লাহ মানুষকে চিন্তা করতে নির্দেশ করেছেন এবং

অর্থাৎ "কিন্তু না—আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করিতেছি ; **যাহা গতিশীল ও স্থিতিবান।"**

আল্লাহ স্বয়ং সেখানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে কতকগুলি নক্ষত্র স্থির সেখানে মহাশূন্যের সমস্তই ঘুরছে একথা যদি কেউ বলে তবে বলতে হবে যে আল্লাহর কথাকে সে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ অবিশ্বাসী ভ্রান্ত পথের পথিক।

৪০ আয়াতে পৃথিবীর কোন উল্লেখ নেই। তাই জোর করে পৃথিবীকে এই 'কুল্লুন' শব্দের মধ্যে এনে যারা ঘোরাবার চেষ্টা করেন তাঁরা দেখুন ৩য় রুকুর প্রথমেই পৃথিবীর কি অবস্থা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "ওয়া আইয়াতুন্ লাহুমুল আরদুল্ মাইতাত।" অর্থাৎ **"এই মৃত পৃথিবীও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন।"**

মৃত বস্তু নড়াচড়া করে না, দৌড়াদৌড়ি করে না, লাফালাফিও করে না।

বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও পৃথিবীর উপর গতি দেবার পরই সুযোগ-সন্ধানী লোকেরা পৃথিবীর গতি আছে বলে ভুল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। কিন্তু মোমেন মুসলিম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তা কোনদিনই স্বীকার করেননি এবং করবেনও না।

পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে চন্দ্র ঐ লীলা কৌশলময় সৃষ্টির (সূর্যের) পশ্চাদগামী হচ্ছে অর্থাৎ সূর্যকে অনুসরণ করে চলেছে। আমরা বৈজ্ঞানিকের থিওরী ও কোরআনের বাণী থেকে জানি যে চন্দ্র সুপরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী আপন কক্ষসমূহের উপর ঘুরছে। যদি তাই সত্য হয় তবে এটা ধ্রুব সত্য যে সূর্যও তার কক্ষের উপর সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই ঘুরছে। অন্যথায় চন্দ্র তাকে কি করে অনুসরণ করবে? সূর্য স্থির থাকলে চন্দ্রের পশ্চাদগামী হবার প্রশ্নই আসে না।

Follow করা অর্থাৎ অনুগামী হবার প্রশ্ন তখনি আসে যখন একটা অপরটার কার্যবিধি সম্পূর্ণই মেনে চলে। যদি আমি দৌড়াই আর কেউ আমাকে অনুসরণ করে তবে তাকেও দৌড়াতে হবে। যদি আমি স্থির থাকি তবে তাকেও স্থির থাকতে হবে। যেখানে চন্দ্র ঘুরছে আমরা মেনে নিয়েছি (কোরআন ও বৈজ্ঞানিকদের মত অনুযায়ী) সেখানে সূর্য না ঘুরলে চন্দ্রের অনুগামী হবার প্রশ্নই আসে না। তাই এখানে আর সন্দেহ থাকতে পারে না যে সূর্য ঘুরছে। চন্দ্র-সূর্যের ঘূর্ণন সম্পর্কে চলুন আমরা আরও বাণীসমূহ দেখি।

পাক-ভারত-বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম **মওলানা রুহুল আমিন** (রঃ) (তাঁর আত্মার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এ ব্যাপারে জোর আন্দোলন শুরু করেন। পৃথিবী স্থির, অবিচলিত অবস্থায় মহাশূন্যের মাঝে আল্লাহর কুদরতে ঝুলে আছে বলে ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন প্রমাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী এই সাক্ষ্য বহন করে।

প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আশরাফ আলী থানভী (রাঃ)-এর জন্য তাঁর কোরআন তফসীরে 'কুল্লুন ফি ফালাকে ইয়াছবাহুন'-এর অর্থ লিখেছেন, "**এবং উভয়েই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে।**" তাঁর এই অনুবাদ নিখুঁত সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত। এই সুস্পষ্ট চিন্তাধারা বিশ্বাসীদের প্রাণে আনন্দ দিয়ে তাঁদের মতবাদকে জোরদার করেছে আর অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত বিশ্বাসী ও দোদুল্যমান চিন্তাবিদদের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানদান করেছে। উপরে

সূরা রা'দ (১৩ঃ২)

[১৩ পারাঃ আয়াত ২]

"আল্লাহ ল্লাজী রাফায়াছ ছামা-ওয়া তি বিগ্বাইরি আমাদিন্ তারাউনাহা ছুম্মাছ তাওয়া আলাল আরশি ওয়া ছাখ খারা শামছা ওয়াল্ কামারা, **কুল্লুই ইয়াজরি লি আজালিম মুসাম্মা,** ইউদাবিবরুল আমরূ ইউফাছ ছিলুল আ-য়া-তি লা আল্লাকুম বিলিক্বা-ই রাব্বিকুম তু-কিনুন।"

অর্থাৎ, "তিনিই আল্লাহ যিনি স্তম্ভসমূহ ব্যতীত নভোমণ্ডলকে সমুত্থিত করিয়াছেন যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ; অনন্তর তিনি আর্শোপরি অধিষ্ঠিত হইলেন এবং **সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পরিভ্রমণ করিতেছে।** নিদর্শনাবলী বিবৃত করিতে তাঁহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যেন তোমার স্বীয় প্রতিপালকের সন্দর্শন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হও।"

ওপরে বর্ণিত আয়াত থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্র ও সূর্য স্ব স্ব কক্ষপথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘুরছে এবং এদের ঘূর্ণনের জন্যই দিবা-রাত্রির বিকাশ হচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত আয়াত-সমূহ আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং এরা পূর্ণ ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

বর্ণিত মহাত্মাদ্বয় শুধু কোরআন হাদিছে পারদর্শী ছিলেন না—আধ্যাত্মিক জগতেও ছিলেন সুপণ্ডিত। আল্লাহর প্রিয়, বিশ্ববরেণ্য এসব অমর মনীষীদের বিশ্লেষণকে যারা অবজ্ঞা করে 'পৃথিবী ঘোরে'—এই মতবাদ প্রচার করতে চান তারা যে কি ধরনের 'মহাপণ্ডিত' প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তির চোখেই তা ধরা পড়বে কেননা 'কুল্লুন' শব্দটি শুধু সূরা ইয়াছিনেই ব্যবহৃত হয়নি, সূরা জোমর, সূরা রা'দ, সূরা ফাতের, সূরা আম্বিয়া ও সূরা লোকমানেও দেখতে পাই ঐ একই অর্থে। অর্থাৎ যেখানেই দিবা-রাত্রি ও চন্দ্র-সূর্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেই এই 'কুল্লুন' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। দিবা-রাত্রি কোন বস্তু নয়। তাই এদের ঘূর্ণনের প্রশ্ন আসে না।

এরা চন্দ্র-সূর্যের ঘূর্ণনেরই প্রতিফল (Result of the revolution of the sun and the moon)। তাই দিবা-রাত্রিকে পর্যায়ক্রমে দেখতে পাই

সূরা ফাতের (৩৫ : ১৩)

[২২ পারা : আয়াত ১৩-এর অংশ]

"ইউলিজেুল লাইলা-ফিন্-নাহারে ওয়া ইউলিজুন নাহার-া ফিল্ লাইলে ; ওয়া সাখ্খারাস্ শামছা ওয়াল্ কামারা **কুল্লুই ইয়াজরি লি আজালিম মুসাম্মা** —।"

অর্থাৎ, তিনি রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন; **এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন, প্রত্যেকেই** নির্দিষ্ট সময়ে পরিক্রমণ করিয়া থাকে।"

সূরা আম্বিয়া (২১ : ৩৩)

[১৭ পারা : আয়াত ৩৩]

"ওয়া হুয়াল্লাজি খালাকাল্ লাইলা ওয়ান্নাহারা ওয়াশ শাম্ছা ওয়াল কামারা ; কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন।

অর্থাৎ, "এবং তিনিই রজনী ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে।"

ঘুরে-ফিরে আসতে। আর এজন্যই একই আয়াতে এ চারটি শব্দের শেষে 'কুল্লুন' শব্দ দেখা যায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লিখিত সূরাসমূহে দেখতে পাবেন।

সূরা জোমরে পৃথিবী, আকাশমন্ডল, দিবা, রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্য এ ছয়টিকে একই আয়াতে আমরা দেখতে পাই এর পরই 'কুল্লুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই আয়াতকে সম্বল করে দু' একজন বিকৃত ব্যাখ্যাকারী যারা পৃথিবী ঘোরে—এমন বাক্য কোরআন থেকে খুঁজে পায় না তারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ও কোরআন-হাদিছকে হেয় প্রতিপন্ন করে মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদিদের হাত সবল করতে বলে যে এই 'কুল্লুন' শব্দে এই ছয়টিকেই ঘোরান বোঝায়। অথচ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আকাশকে ঘোরাতে পারেননি। দিবা ও রাত্রির বর্ণনাও চুপি চুপি এড়িয়ে গিয়ে বলে ফেলেছেন—তাই পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র ঘুরছে। আর তিনটি শব্দ কিভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে দিলেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

স্বরা লোকমান (৩১ : ২৯)

[পারা ২১ঃ আয়াত ২৯]

"আলামত্বম তারা আন্নাল্লাহা ইউলিজব্বল লাইলা ফিন্‌নাহারে ওয়া ইউলিজত্বন নাহারা ফিল লাইলি ওয়াছ ছাখ্‌ খারাশ শামছা ওয়াল ক্বামারা কুল্লত্বই **ইয়াজরি ইলা আজালিম্ মুসাম্মা ওয়া আন্না-ল্লাহা বিমা**—তায়মালত্বনা খাবির।

অর্থাৎ, "তোমরা কি দেখিতেছ না যে—আল্লাহ রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রজনীতে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন **এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন উহারা প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে** এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।"

ওপরে উল্লিখিত কোরআনের বিভিন্ন আয়াতসমূহ হতে আমরা দেখলাম **চন্দ্র সূর্য স্থির নয়**। তারা উভয়েই স্ব স্ব কক্ষ-সমূহের ওপর নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার করে আবর্তন করছে। এ কুল্লন এ পৃথিবী কোথায়।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বর্ণনা আয়াতের প্রথমাংশেই শেষ হয়েছে, এই বলে "তিনিই সত্যভাবে (সঠিকভাবে) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন"—এটি বাক্যাংশ হলেও (৫ম আয়াতের) স্বয়ং সম্পূর্ণ। পরবর্তী বাক্যাংশগুলির ওপর নির্ভরশীল নয় কেননা এ বাক্যাংশের ক্রিয়া সৃষ্টি করা—পরবর্তী বাক্যাংশের ক্রিয়া **'আবৃত্ত করা' 'ও আয়ত্তাধীন করা'** হতে পৃথক। তাই এ আয়াতে ব্যবহৃত 'কুল্লন' শব্দটি যে আকাশ ও পৃথিবীকে বোঝায়নি তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আল্লাহ, স্বয়ং তাঁর বাণীর বিশ্লেষণ দিয়ে পূর্বে উল্লিখিত প্রতিটি সূরাতে এ দুটো শব্দকে বাদ দিয়ে দিবা-রাত্রি ও চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে 'কুল্লন' শব্দ ব্যবহার করেছেন—আর পৃথিবী ও আকাশকে পৃথক করে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে পৃথিবী স্থির (পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাঁর বাণীসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে)।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুবাদও প্রমাণ করে যে এ 'কুল্লন' শব্দটি বিশেষভাবে চন্দ্র ও সূর্যকেই অর্থ করে যদিও এর সঙ্গে জড়িত দিবা ও রাত্রি। তাই কেউ Each one কেউ বা Each শব্দ ব্যবহার করেছেন ? এবং সঙ্গে সঙ্গেই সবরের প্রশ্নটিরও সমাধান দিয়েছেন। কেউ All বা Every thing শব্দ ব্যবহার করেননি।

আল্লামা ইউছুফ সাহেব লিখেছেন, "He has subjected the Sun and the Moon to His law. Each one follows a course for a time appointed." (The Troops)

মর্মাডিউক পিকথল লিখেছেন, (The Troops-V.no5) "He constraineth the succeed the Sun and the Moon to give service, each running on for an appointed term.''

বাংলা ভাষায়ও ঠিক অনুরূপ তর্জমাই হয়েছে। তাঁরা লিখেছেন, "উহারা উভয়েই', 'উহারা প্রত্যেকেই', 'সকলেই'—এসব শব্দ চন্দ্র সূর্যকেই অর্থ করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে নয়।"

সূরা ইয়াছিনে মর্মাডিউক পিকথল সাহেব ৪০নং আয়াতের তর্জমা এরূপ করেছেন, "It is not for the Sun to overtake the Moon nor doth the Night outstrip the day. They float in an orbit."

অনুরূপভাবে আল্লামা ইউসুফ সাহেব শেষ লাইনের তর্জমায় লিখেছেন, "Each (Just) swims along in (its own) orbit, They & Each—সমস্তকেই বোঝায় না।"

ফলক—আরবদের ভাষায় প্রত্যেক ঘূর্ণায়মান বস্তুকে 'ফলক' বলা হয়। আলফার্ক-এর বহুবচন।

জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তাঁদের মতে ফলক কোন শরীরবিশিষ্ট পদার্থ নয়—বরং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কক্ষপথ।

ইমাম জোহাক একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও তাবেয়ীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইমাম কালবীর মতে, ফলক অর্থ জলসমষ্টি।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির তাবরীর লিখিত তফসীর তাবরীর সপ্তম খণ্ডে ১৭/১৮ পৃষ্ঠায় (মিছরী ছাপা) 'ফলক' শব্দের বহু গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরে দেখিয়েছেন—'ফলক' অর্থ দ্রুতগতি, গাড়ির চাকার লৌহ চক্র, তরঙ্গ বেষ্টনী, গাড়ির চাকা ইত্যাদি।

সবগুলোর অর্থ নিয়ে আমরা এখন পরিষ্কার ধারণা করতে পারি যে মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিভ্রমণের স্ব স্ব কক্ষপথ। যে পথে চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজি ঘুরছে। **আরদা (পৃথিবী) শব্দের পরে এ ফলক শব্দটি কোথাও কোরআনে ব্যবহৃত হয়নি। এ বিষয়ের উপর আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছি। পৃথিবী ঘূর্ণনের কোন কক্ষপথ নেই।**

সূর্যের গতিবিধি

সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। একথা আমরা বরাবরই মেনে নিয়েছি। এমনকি পৃথিবী ঘূর্ণনের কথা স্বীকার করলেও কেউ কোনদিন বলেননি বা বিশ্বাস করেননি যে সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়।

পৃথিবী সত্যই উদিত হচ্ছে, না সূর্যই হচ্ছে? কোরআনে কোথাও খুঁজে পাইনি যে পৃথিবী পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে বরং সূর্যের উদয় এবং অস্তের কথাই বলা হয়েছে এবং এর ঘূর্ণনের পন্থাও পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ করেছে। নিম্নোক্ত বাণীসমূহ সে সাক্ষ্য বহন করে।

সূরা বকর (২ : ২৫৮)
[পারা ৩ : আয়াত ২৫৮]

"ইজক্বালা ইব্রাহিমু রাব্বিল্লাজি ইউহই ওয়া ইউমিতু, ক্বালা আনা উহ্ই ওয়া উমিতু ; ক্বালা ইব্রাহিমু ফা ইন্নালাহা ইয়াতিবিশ্ শাম্ছি মিনাল্ মাশ্ রিকি ফাতিবিহা মিনাল মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাজি কাফারা, ওয়াল্লাহুলা ইহাদিল ক্বাউমাজ্ জালেমিন।" অর্থাৎ,

"যখন ইব্রাহিম বলিয়াছিল—আমার প্রতিপালকই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন, সে বলিয়াছিল, আমিই জীবন দান করি ও, মৃত্যু দান করি, ইব্রাহিম বলিয়াছিল—নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব হইতে সমুদিত করেন কিন্তু তুমি উহাকে পশ্চিম হইতে সমুদিত কর ; ইহাতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হইয়াছিল, এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

সূরা কাহাফ (১৮ : ৮৬)

[পারা ১৬ : আয়াত ৮৬]

"হাত্তা ইজা বালাগা মাগরিবাশ্ শামছি ওয়া যাদাহা তাগ্‌রুবু ফি আইনিন হামিয়াতি ওঁওয়া ওজাদা ইন্‌দাহা ক্বাউমান্। ক্বুল্‌না ইয়াযাল কারনাইনে ইম্মা আন্ তুয়াজ্জিমা ওয়া ইম্মা আন্ তাত্তাখিজা ফি হিম খুস্ নান্।"

অর্থাৎ, "অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পেঁাছিল সে সূর্যকে এক কালো রং-এর সাগরে ডুবিতে দেখিল এবং সেখানে দেখিতে পাইল এক জাতি। আমি বলিলাম, 'হে যুলকার নাইন! হয় ইহাদের শাস্তি দাও না হয় ইহাদের সহিত ভাল ব্যবহার কর'।"

সূরা কাহাফ (১৮ : ৯০)

[আয়াত ৯০]

"হাত্তা ইজা বালাগা মাত্‌লিয়াশ্ শাম্‌ছি ওয়া যাদাহা তাৎলুউ আলা ক্বাউমিল্‌লাম্ নাজয়াল ল্লাহুম মিন দুনিহা সিত্‌রান।"

অর্থাৎ—"অবশেষে যখন সে **সূর্য উদয়** হইবার স্থানে পেঁাছিল সে সূর্যকে এক জাতির উপর **উদিত হইতে** দেখিল যাহাকে আমি উহা হইতে আশ্রয় পাওয়ার কোন আবরণ দেয় নাই।"

সূরা তা-হা (২০ : ১৩০)

[পারা ১৬ : আয়াত ১৩০]

"ফাস্‌বির আলা মা' ইয়াক্বুলুনা ওয়া ছাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ক্বাব্‌লাতুলুয়েশ্ শাম্‌ছে ওয়া কাব্‌লা গুরুবিহা ওয়া মিন্ আ-না ইল্ লাইলে ফাছাব্বিহ্ ওয়া আত্‌রাফান্ নাহারি লা-ইয়াল্লাকা তারদা।"

অর্থাৎ, "অতএব তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক এবং সূর্য উদয় হইবার পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা করিতে থাক এবং রাত্রির কিছু অংশ একদিনের শুরুতে এবং শেষেও এবং তাহার মহিমা প্রকাশ করিতে থাক। তবেই তুমি আনন্দের সহিত সন্তুষ্ট হইবে।"

সূরা শোয়ারা

[আয়াত ৬০]

"তৎপর তাহারা সূর্য উঠিবার সময়ে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।" —ফাত্তাবাহুম মুশরিকিন।

সূর্যের উদয় এবং অস্ত, কক্ষের ওপর এর পরিক্রমণ, গতিবিধি সবকিছুই আমরা দেখলাম। এবার চলুন, আমরা পৃথিবীর অবস্থা দেখি।

পৃথিবী স্থির

সূরা ফাতের (৩৫ : ৪১)
[পারা ২২ : আয়াত ৪১]

"ইন্নাল্লাহা ইউমছিকুছ্[১] সামাওয়াতে ওয়াল আরদা আন্‌ তাজ্‌লান[২]। ওয়া লাইন যালাতা—ইন্‌ আমছাকাহুমা মিন্‌ আহাদিস্‌ মিম্‌ বায় দিহি। ইন্নাহু কানা হালিমানগাফুরা।"

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এমন ভাবে ধারণ করেছেন যেন ওঁরা স্ব স্ব স্হান হতে নড়া-চড়া করতে না পারে।" কিন্তু যদি ওরা—নড়ে সরে যায়ই তবে তাদের ধরে রাখার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।"

টীকা ১। ইউমছিকুছ : প্রকৃত শব্দ মসাক। এর অর্থ (১) ধারণ করা, (২) রক্ষা করা, (৩) সামলে রাখা, (৪) বাধা দেওয়া।

টীকা ২। তাজুল : প্রকৃত শব্দ জাওয়াল। এর অর্থ (১) কম্পিত হওয়া, (২) নড়াচড়া করা, (৩) দৌড়াদৌড়ি করা, (৪) স্থানচ্যুত হওয়া, (৫) নষ্ট হওয়া।

'ইন্নাল্লাহা ইউমছিকু সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্বা আন্‌ তাজুলান' —এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় "নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে নড়াচড়া হতে ধরে রেখেছেন।"

মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান সাহেব লিখেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে বিচ্যুত হইতে বিরত রাখিয়াছেন।"

মাওলানা হাকিম আব্দুল মান্নান এর তর্জমায় লিখেছেন, "এ যে তাঁরই নির্দশন সমূহের মধ্যে অন্যতম—আসমান জমিন তাঁরই হুকুমে সুস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"

যেহেতু তাজুলার পূর্বে আন শব্দ আছে যার অর্থ 'যেন'—তাই এ আয়াতটির বাংলা ও ইংরেজি তর্জমার প্রায় মনীষীরাই ক্রিয়াটির না-বোধক অর্থ প্রয়োগ করে আরও পরিষ্কার করেছেন এই বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যে ওরা নড়তে, সরতে বা স্থানচ্যুত হতে পারছে না।" ইংরেজিতে ঠিক এমনি ভাবেই বলা হয়েছে :

সূরা রুম
[পারা ২১ : আয়াত ২৫]

"ওয়ামিন আইয়া-তিহি আনতাকুমাছা' ছামাউ, ওয়াল আরদ্বি আমরিহিঃ ছুম্মা ধজা দা আ কুম্ দাওয়াতাম মিনাল্ আরদ্বি ইজা আন্তুম তাখরুজুনা।"

'অর্থাৎ, "এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও একটি এই যে তাঁহারই আদেশে **আকাশ ও পৃথিবী স্থির রহিয়াছে,** তৎপর যখন তিনি তোমাদিগকে মাত্র একবার ডাকিবেন তখন তোমরা ভূমি হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিবে।"

ওপরের বর্ণিত সূরা ফাতের ও সূরা রুম হতে দেখা যাচ্ছে যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে আছে

"Lo! Allah graspeth the heavens and the earth they deviate not and if they were to deviate there is no one that could grasp them after Him. Lo! He is ever element, Forgiving." (Translated by—MARMADUKE PICKTHALL)

এরূপ তর্জমায় বিকৃত বা ভুলেরও কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে ধরে রাখার পর তাদের স্থানচ্যুত হয়ে নড়াচড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এ জন্য 'না'-বোধক অর্থটি সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

অনেকে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করেন এই বলে যে, 'তাজুলা' শব্দের পূর্বে 'লা' নেই তাই না বোধক অর্থে (Negative sense) হবে না। আর একদল পণ্ডিত যাঁরা আল্লাহর ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের অমর্যাদা করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের প্রেরণা দিচ্ছেন। 'লা'—তাজুলার পূর্বে 'না' থাকার সুযোগ নিয়ে বলছেন যে আকাশ ও পৃথিবী প্রচণ্ড গতিতে দৌড়াচ্ছে।

অর্থাৎ আল্লাহ এদের সামলে রাখতে পারছে না (নাউজুবিলাহ)। তাঁরা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী সবই ঘুরছে। তাই এমন অপব্যাখ্যা দিয়ে সবার চোখে ধুলো দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। দেখুন 'লা' শব্দ না দিয়েও 'না'-বোধক অর্থ হয় কি না।

এবং চিরদিন অবিচলিত অবস্থায়ই থাকবে আল্লাহর পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত। ঘোরা-ফিরা করা, নড়াচড়া করা বা এদিক ওদিক হেলে দুলে স্থানচ্যুত হবার কোনই সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ তাঁর শক্তি মহিমার গুণেই এদের এমনিভাবে আটকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর আদেশ ও শক্তির এটা একটা অপূর্ব নিদর্শন এরূপ আরও বহু নিদর্শন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দেখিয়েছেন যার মাত্র কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত হলো।

সূরা নাহাল

[পারা ১৪ : আয়াত—১৫]

"ওয়া আলক্বা ফিল্ আরদ্বে রা **ওয়াসিয়া আন্ তামিদাবিকুম** ওয়া আনহা'-রাউ ওয়াছবুলাল্ লায়াল্লাকুম তাহ্তাদূন।"

অর্থাৎ, "এবং পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন—**যেন তোমাদের সহিত তাহা আলোড়িত না হয়** এবং স্রোতস্বিনী ও পথসমূহ—যেন তোমরা সুপথগামী হও।"

---

(১) ক্বালা আয়ূজু বিল্লাহ আন্ আকুনা মিনাল যালেমিন।

[সূরা বকর। ১ম পারা]

অর্থাৎ "সে বলেছিল—আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি—যেন **আমি মুর্খদের অন্তর্গত না হই।**"

এখানে "আকুন।" শব্দের পূর্বে 'লা' ব্যবহৃত হয়নি। এখন কি তবে অর্থ করতে চান :

"সে বলেছিল আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি—যেন মূর্খদের অন্তর্গত হই।"

মূর্খদের জন্যই এমন ব্যাখ্যা শোভা পায়। কোরআনে বহু আয়াত এরূপ দেওয়া আছে, দেখুন—এগুলোর অর্থ কি ?

সূরা নমল (২৭ : ৬১)
[২০ পারা : আয়াত ৬১]

"আম্মান জায়লাল্ আরদ্বা ক্বারা রাউ ওয়া জ্বায়ালা খিলা-লাহা-আন্হা রাউওয়া জায়ালা লাহা বাওয়াসিয়া ওয়া জায়ালা বাইনাল্ বাহ্‌রায়নি হাজিরান, আ-ইলাহুম্ মায়াল্লাহি ? বাল্ আক্‌সারুহু লা-ইয়ালামুন।"

অর্থাৎ, "ওহে বলত ! কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে স্থির

"ইউবায়িনুল্লাহ লা-কুম আনতাদিল্লু। ওয়াল্লাহু বি-কুল্লে শাইয়েন আলীম।"

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করিতেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। এবং আল্লাহ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"

[সূরা নেসা। শেষ আয়াতের শেষাংশ]

(২) যদি কোন কোরআন ব্যাখ্যাকারী এরূপ বিশ্লেষণ করেন যে যেহেতু 'আন'-এর পর অর্থাৎ 'তাদিল্লু' এর পূর্বে 'লা' নেই তাই এর অর্থ হবে :

"আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করিতেছেন—যেন তোমরা বিভ্রান্ত হও। তবে এ বিশ্লেষণকারীরা কি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রমাণ করিতেছে না ?"

(৩) "ওয়া যাযাল্ না আলা কুলুবিহিম আকিন্নাতান্ আই-য়াফ কাহুহু ওয়াফি আজানিহিম ওয়াকরান।"

অর্থাৎ, "এবং আমি তাহাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ দিয়াছি, যেন তাহারা বুঝিতে না পারে।" [সূরা আন্ আম, আয়াত ২৫]

যারা মূর্খ—ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ভাড়াটিয়া চর তারাই কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যা করবেন :

"আমি তোমাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।"

চলুন কোরআনের এরূপ বাণী আরও দেখি।

(৪) "ওয়া লা-ইয়াজরি মান্নাকুম শানানু কাউমেন আন্-ছাদ্দুকুম আনেল্ মাসজিদেল হারামে আন্-তাতাদু"। [সূরা মায়েদা। আয়াত ২-এর

রাখিবার জন্য পাহাড় পর্বত সৃজন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে সীমারেখা স্থাপন করিয়াছেন! তবে বলত আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন খোদা থাকিতে পারে কি? কিন্তু তথাপি তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই বুঝিতেছে না।"

অর্থাৎ, "যাহারা তোমাদিগকে পবিত্র মসজিদ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে—সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন **তোমাদিগকে সীমা লঙ্ঘনে উত্তেজিত না করে।"**

এখানে আন্-তাত্তাদু—এর পূর্বে লা নেই। কি অর্থ করবেন? না যোগ না করলে আল্লাহর কথার সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ হবে। এতে কি নিজেকে অবিশ্বাসী বলে প্রমাণ করবেন না? দেখুন এরূপ আরও কত বাণী।

(৫) "ইয়া-আহলেলু কেতাবে ক্বাদ-যা-য়া কুম রাছুলুনা ইউ-বাইনু লাকুম আলা ফাত্‌রাতেম্—মিনার-রছুল আন-তা লু মা যা-আনা মিম্ বাছিরেনও ওয়ালা নাদিবেন।" [সূরা মায়েদা, আয়াত ১৯]

অর্থাৎ, "হে গ্রন্থানুগামীগণ রছুলগণের আবির্ভাব ধরার অবসানে আমার রছুল তোমাদের নিকট আগমন পূর্বক বর্ণনা করিতেছে—**যেন তোমরা না বল যে**, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদাতা ও ভয় প্রদর্শক আগমন করেন নাই।"

এখানে কি অর্থ করবেন? এখানেও **আন্** তাকুলু—এর পূর্বে লা নেই।

এখানে কি এই অর্থ করতে চান: "যেন তোমরা বল—আমাদের নিকট··· নাই।"

আল্লাহর সঙ্গে বেইমানী করে পুরস্কার ও বাহবা নেওয়ার আশা করলে—লাহাব, আবু-জেহেল, আবু-সুফিয়ানের মত অবিশ্বাসী হয়ে মরবেন।

যেখানে যে শব্দ বা অক্ষর প্রয়োজন, ঠিক তাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার অলংকার, শাব্দিক অর্থ, বিষয়বস্তু, আধ্যাত্মিক, জাগতিক, পারমাত্মিক, সবকিছু মিলেই জগতের অতুলনীয় গ্রন্থ। আল্লাহ স্ব হস্তে ধরে রাখার পর নড়াচড়ার যেমন প্রশ্ন আসে না তার পরিষ্কার বর্ণনার পরেও তেমনি বিভ্রান্ত হবার প্রশ্ন আসে না। এজন্যই এ সব ক্ষেত্রে 'লা' শব্দটি উহ্য আছে! ফলে অলংকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে ভাষার লালিত্য এবং উদ্দেশ্যও তেমনি পরিস্ফুট হয়েছে। এ সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের

সূরা লোকমান (৩১ : ১০)
[২১ পারা : আয়াত ১০]

"খালাক্বাছ ছামাওয়াতি বেগবায়রি আ'মাদিন তারাউনাহা ওয়া আল্‌কা ফিল আরদিব রাওয়াসিয়া আন্‌ তামিদাবিকুম্‌ ; ওয়া বাচ্ছা ফিহা মিনকুল্লি দা-ব্বাতিন ; ওয়া আন্‌ জাল্‌ না মিনাস সামায়ে মা-আন্‌ ফাম্‌বাত্‌ না ফিহা মিন্‌ কুল্লি যাওজিন্‌ কারিম।"

অর্থাৎ "তিনিই স্তম্ভবিহীন আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা তোমরা অবলোকন করিতেছ এবং পৃথিবীতে **পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন যেন তোমাদের সহিত উহা আলোড়িত না হয়।** এবং তিনি তন্মধ্যে সর্ব প্রকার জীবজন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন ; এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছি ; তৎপর উহাতে সর্ব-প্রকার উৎকৃষ্ট বিষয় উদ্‌গত করিয়াছি।"

দৃষ্টি এড়ায়নি। যাঁরা এসব বাণী বিশ্লেষণ করেছেন—এর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যা দেখুন—

বিশ্ববিশ্রুত মনীষী **জামাখশারী** সূরা ফাতেরের এ আয়াতের বিশ্লেষণ দিয়ে বলেছেন : 'যেহেতু পৃথিবীর স্থিরতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই এবং এর অর্থ বুঝতে কোনই অসুবিধা নেই তাই না-বাচক 'লা' শব্দটি উহ্য রাখা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। [কাশ-শাফ জামাখসারী]

মৌলানা রুহুল আমিন, আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী, আশরাফ আলী থানভী, ইমাম ইবনে জাবির, সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদী প্রমুখ তফসীরকারকগণও একই মত প্রকাশ করেছেন। সাহাবিদের ব্যাখ্যাতেও সে কথাই মেলে। তাই 'আন তামিদার' অর্থ ঐ স্থলে—**'যেন না কাঁপে।'**

'লা' শব্দ যোগ করেও হাঁ-বাচক (Affirmative) অর্থ হয় এমন দৃষ্টান্তও কোরআনে আছে। অলংকার বৃদ্ধি অথবা গূঢ় কোন রহস্য নিহিত রয়েছে বলেই এসব শব্দগুলো যোগ বিয়োগ আল্লাহপাক করেছেন। সূরা হাদিসের ২৯ নং আয়াত এর সাক্ষ্য বহন করে।

"লিয়াল্লা ইয়ালামা আহলুল কিতাবে আল্লা ইয়াকদেরুনা আল শাইয়েম মিন ফাজলিল্লাহে।"

সূরা আম্বিয়া (২১ : ৩১)
[১৭ পারা : আয়াত ৩১]

"ওয়া জআয়াল্‌না ফিল্‌ আরদ্বি রাওয়াসিয়া[৪] আন্‌ তামিদাবিহিম ; ওয়া জআয়াল্‌না ফিহা ফিজাজান ছুবলাল্‌ লা-য়াল্লাহুম ইয়াহ্‌তাদূন।"

অর্থাৎ "**এবং আমি এইজন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যেন উহা তৎসহ আন্দোলিত না হয়।** এবং উহার মধ্যে আমি প্রশস্ত পথসমূহ প্রস্তুত করিয়াছি যেন তাহারা ঠিকপথে চলিতে পারে।"

এখান থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ, পৃথিবীর বুকে অত্যন্ত ভারী পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছেন যেন পৃথিবী দুলতে না পারে, কাঁপতে না পারে ও আলোড়িত না হয়। যেখানে দোলনের, কম্পনের ও আলোড়নের প্রশ্ন আসে না সেখানে সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল ব্যাপী ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘুরবার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক, ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। পর্বতমালা পৃথিবীকে স্থির রেখেছে।

সূরা লোকমান কি সুন্দরভাবেই আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন দেখাচ্ছে। খুঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন। আবার শূন্যের মাঝে ঝুলন্ত পৃথিবীর বক্ষে খুঁটি দিয়ে কিভাবে আটকিয়ে রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবী কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। দুটো অচল, অটল, স্থির ও চিরস্থায়ী। জ্ঞানী বিজ্ঞানী

অর্থাৎ, "**যেন গ্রন্থানুগামীগণ জানিতে পারে** যে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উপর তাহাদের কোনই অধিকার নাই।"

যারা তাজ্‌লা শব্দের পূর্বে 'লা' নেই বলে পৃথিবীর ওপর গতি চাপিয়ে দিতে চান তাদের মতে উপরোক্ত বাণীর অর্থ করতে হবে—"**যেন গ্রন্থানুগামীগণ জানিতে না পারে** যে—আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উপর তাহাদের কোনই অধিকার নাই।" এমন অর্থ করলে কি **আল্লাহর ভুল ধরা হয় না ?**

ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এমন নিদর্শন দেখে আত্মভোলা হয়ে যায় আর সেই মহান শক্তির কাছেই হৃদয়মন সঁপে দিয়ে তাঁরই করুণা ভিক্ষা চায়।

এবারে আসুন আমরা দেখি কেন পৃথিবীকে আল্লাহ স্থির রেখেছেন। এর কারণ কি?

সূরা নবা

[৩০ পারা : আয়াত ৬-৭]

"আলাম নাজ্‌আলিল আরদ্বা **মেহাদাও** ওয়াল জিবালা আওতাদান।"

অর্থাৎ "আমি কি পৃথিবীকে শয্যা করি নাই; এবং পর্বত-মালাকে কীলক স্বরূপ?

এ ছাড়া 'আন-তামিদার' অর্থ যদি প্রচণ্ড গতিতে বোঝাত, তাহলে চন্দ্র সূর্যের পরে প্রতিটি স্থলেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কোরআনের কোন আয়াতেই তা নেই। দেখবার শক্তিও কোন পাঠকের নেই। তাই স্থূল ব্যাখ্যা ধরা পড়বেই।

সূরা নাহাল, সূরা লোকমান ও সূরা আম্বিয়াতে **'আন্-তামিদাবিকুম'** ও **'আন্-তামিদাবেহিম'** ব্যবহৃত হয়েছে। তামিদার পূর্বে 'লা' নেই অথচ না-বোধক অর্থই হবে, হাঁ-বোধক নয়।

টীকা ৩। তাকুমা : সূরা রূমে ব্যবহৃত। কাওম হতে উৎপন্ন। এর অর্থ স্থির, অনড়, অটল, বদ্ধমূল, সুপ্রতিষ্ঠিত, কায়েম, দাঁড়ানো।

অনেকেই সূরা রূমের ২৫ আয়াতের তর্জমায় তাকুমার অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত বা কায়েম শব্দ ব্যবহার করেছেন। অপব্যাখ্যাকারীরা এ শব্দ দুটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলেছেন যে সুপ্রতিষ্ঠিত বা কায়েম অর্থ স্থির নয়—অস্থিরতাই আকাশ ও পৃথিবীকে নিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে দৌড়াচ্ছে। বাংলা ভাষায় যাদের সামান্যতম জ্ঞানও আছে তাঁরা এদের নির্বোধ না বলে পারবেন না। কেননা এ সুপ্রতিষ্ঠিত বা কায়েম শব্দটি এমন স্থলে ব্যবহৃত হয় যে তার বিশেষ্যটি অনড়, অটল বা সুস্থির ছাড়া বোঝায় না। যেমন,

সূরা মুমিন
[২৪ পারা : আয়াত ৬৪]

"আলাহু-ল্লাজি জআয়ালা লাকুম আরদ্বা কারাকাউ ওয়াস্-সামা'য়া বেনায়ান—— ।"

অর্থাৎ, "তিনিই আল্লাহ যিনি আমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থির বাসস্থানরূপে এবং আকাশকে চাঁদওয়ার ন্যায় তৈরী করেছেন।"

("Is it not he (best) who made the earth a fixed above ?) [Marmaduke Pickthall]

সূরা জোখ্‌রোখ
[২৫ পারা : আয়াত ১০]

"আল্লাজি জআয়ালা লাকুম আরদ্বা মাহদাউ' ওয়া জআয়ালা লাকুম ফিহা ছুবুলাল্-লায়াল্লাকুম তাহ্‌তাদূন।"

অর্থাৎ, "তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ করিয়া দিয়াছেন—যেন তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।"

---

(১) ইসলাম একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। আজীবন তা কায়েম থাকবে।

(২) বৃক্ষের মূল যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত তেমনি মহাপুরুষদের বাক্যও অনড়।

(৩) সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো আর অসত্য বিদূরিত হলো।

(৪) ডক্টর কুদরত-ই খুদার আসনটি যেমন কায়েম হলো, মতবাদটিও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

সুপ্রষ্ঠিত—এর ইংরেজি প্রতিশব্দও (১) Stand fast, (২) Established Firmly, (৩) Founded Steadily.

বাইবেলের বাংলা তর্জমাতে এ 'সুপ্রতিষ্ঠিত' শব্দের স্থলে লেখা হয়েছে 'সুস্থির'। পৃথিবীর পরিবর্তে জগৎ। জগৎ ও পৃথিবীতে যতটুকু ব্যবধান সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুস্থির শব্দেও ততোটুকু ব্যবধান। সূরা রূমের এ আয়াতটির ইংরেজি অনুবাদে কিভাবে লেখা আছে তা দেখুন :

কোন ঘূর্ণনশীল বস্তুই জীবজন্তুর বাসস্থানের উপযোগী নয়। ট্রেন, বাস, ট্রাম, মটর গাড়ি যেগুলো সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলে সেগুলোই যেখানে বাসোপযোগী নয় সেখানে বিভিন্ন গতিতে (ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল আহ্নিক গতি ও ৭০ হাজার মাইল বার্ষিক গতি) কক্ষের উপর ঘূর্ণনশীল পৃথিবী কি করে আবাস্থল হতে পারে—একথা কোন সুস্থ মস্তিস্ক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিই ধারণা করতে পারে না। **কোন গ্রহ-নক্ষত্রকেই আল্লাহ 'মাহদান'[৫]—বা 'কারাবান'[৬] বলে উল্লেখ করেননি—করেছেন শুধু পৃথিবীকে। অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়া কোন গ্রহ উপগ্রহই জীবজন্তুর বাসস্থান নয়, শয্যা নয়, আবাসস্থল নয়** এ জন্যেই এর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—একে রহস্যময় করে সৃষ্টি করা হয়েছে—এর বক্ষে কীলক দিয়ে স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এ কীলক চিরস্থায়ী, অভঙ্গুর, অটল ও অচল। এর উপর আঘাত হেনে কেউ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না। আর যখন তা বিচলিত হবে ঐ কিয়ামতের দিন তখন পৃথিবীও আর স্থির থাকবে না। মহাকম্পনে প্রকম্পিত হতে থাকবে। এ ভারী পাহাড় মেঘমালার ন্যায় বা বিধুনিত তুলার ন্যায় বাতাসের সঙ্গেই চলতে থাকবে। পাহাড়ের গতি, পৃথিবীর গতি তখনি মাত্র দেখা যাবে এর পূর্বে নয়। আল্লাহর বাণী তার সাক্ষ্য দেয়।

"And of His Signs is this--The Heavens and the Earth stand fast by His command and afterwords when He calleth you lo ! from the Earth ye will emerge."

[Marmaduke Pickthall]

'কুম' ক্রিয়া শব্দে ব্যবহৃত হয় আদেশ অর্থে। যেমন, দাঁড়িয়ে থাক—এর আরবী 'কুম'।

তাকুমা—এর পূর্ববর্তী শব্দগুলো **সামাওয়া ওয়াল আরদ্বা বে আমরিহি।**

সামাওয়াতু অর্থ আকাশ। আরদ্বা অর্থ পৃথিবী। বে আমরিহি—

সূরা জিলজাল

[৩০ পারা : আয়াত ১-২]

"ইজা জুলজিলাতিল্ আরদু জিল্‌জালাহা ; ওয়া আখ্‌রাজাতিল্ আরদু আছ্‌কালাহা।"

অর্থাৎ, "যখন পৃথিবী উহার পূর্ণ কম্পনে প্রকম্পিত হইবে এবং পৃথিবী স্বীয় ভারসমূহ বহির্গত করিয়া দিবে।"

তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহ আদেশ করেছেন আকাশ ও পৃথিবীকে দাঁড়িয়ে থাকতে। অর্থাৎ অনড় অবস্থায় স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকতে। আদেশের উদ্দেশ্যে 'তাকুমার' এ অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ থাকলেও প্রযোজ্য নয়। এ জন্যই একান্ত মূর্খ ছাড়া জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বা আধ্যাত্মিক ও পন্ডিত ব্যক্তিরা এর বিরূপ অর্থ করে আকাশ ও পৃথিবীকে গতিশীল করে ঘোরাননি। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ তফসীরকারক ও আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষগণ—যাঁরা দিব্যচক্ষুতে অনেক কিছুই দেখে থাকেন তাঁরা সবাই লিখে গেছেন যে পৃথিবী অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে এদিক ওদিক নড়তে সরতে পারছে না ; আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর তফসীর দেখুন। বিশ্ববিশ্রুত কবি পূর্বদেশীয় গেটে, মৌলভী জালালউদ্দিন রুমী বহু শতাব্দী পূর্বে তাঁর **মসনবী শরীফে** মহাকর্ষণের সূত্র দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পৃথিবীর স্থিরতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"প্রাকৃতিক বিধানে জগতের সমুদয় উপাদান পরস্পর সংযোজিত এবং একটি প্রেমভরে আর একটির প্রতি আকৃষ্ট।"

জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্যের সহিত সম্মিলন প্রয়াসী ; যথা—চুম্বক লৌহ-দন্ড, তৃণ লতার প্রতি আকৃষ্ট।

জ্যোতিষ্কমন্ডলী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদি পৃথিবীকে সাদর সম্ভাষণ করে বলছে—"চুম্বকের সহিত লৌহের যেরূপ সম্বন্ধ তোমার সহিতও আমাদের সেইরূপ সম্বন্ধ।"

কোন্ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল—"এই ভূমন্ডল কিরূপে এই নভোমন্ডল বেষ্টিত শূন্য মার্গে অবস্থান করিতেছে, না উর্ধ্বে ধাবিত হইতেছে ?"

সূরা কারিয়া
[৩০ পারা : আয়াত ১-৫]

আল্-কারিয়াতু মা'ল্ কারিয়া ; ওয়া মা আদ্‌রাকা মা-ল্-কারিয়া। ইয়াওমা ইয়াকুনুন্নাছু কাল্ ফারাশিল মাব্‌ছুছিওয়া তাকুনুল্ যিবালু কাল্ ইহ্‌নিল মান্‌ফুস্।"

অর্থাৎ, "আঘাতকারী ; ঐ আঘাতকারী কি ? এবং তুমি কি জান যে—সে আঘাতকারী কি ? **যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় হইবে এবং পর্বতমালা বিধুনিত পশমের ন্যায় হইবে।**"

ওপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে পৃথিবী স্থির—এর কম্পন নেই। থাকলে তা বাসস্থানের উপযোগী থাকে না—এর বুক থেকে সব ছিটকিয়ে পড়ে যেত। যেদিন এ অবস্থা হবে সেদিন পর্বতমালা তুলা বা পশমের মতো উড়ে যাবে। পৃথিবী তার ওজন হারাবে—আকর্ষণী-শক্তি থাকবে না অর্থাৎ unbalanced হবে। জীবজন্তু ও মানুষ পঙ্গপালের ন্যায় দিশেহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকবে—উপায় থাকবে না। শয্যা বা বাসস্থান তো দূরের কথা, দাঁড়াবার মত তিলধারণের ঠাঁই মিলবে না।

সূরা জেলজাল ও সূরা কারিয়া থেকে আমরা পৃথিবী ও পাহাড়ের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হবে তা দেখলাম। এবারে চলুন কোরআনের একই আয়াত থেকে পৃথিবী ও পাহাড়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা একসঙ্গে দেখি এবং বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিই এরা স্থির না অস্থির।

দার্শনিক তাকে উত্তর দিলেন—

"**আকাশ বা সৌরজগতের গ্রহাদির আকর্ষণ শক্তিতে জগৎ ষষ্ঠ দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে।**"

যেমন, "একটি চুম্বকের শূন্য গোলকের মধ্যে এক দোদুল্যমান লৌহদন্ড সংরক্ষিত হইলে তাহা যেরূপ ঝুলিতে থাকে ঠিক তদ্রূপ।"

টীকা ৪। রাওয়াসিয়া—অর্থ খুটি, কীলক, পাহাড়।

সূরা নমল

[২০ পারা : আয়াত ৮৭-৮৮]

"ওয়া ইয়াওমা ইউন্‌ফখ্‌ফি ছুরি ফা ফাজিয়া মান্ ফি সামা-ওয়াতি ওয়া মান্‌ফিল আরদ্বি ইল্লা মা' শা-য়া-আল্লাহু ; ওয়া কুল্লু-আতাহু দাখিরিন। ওয়া তারাল জিবালা তাহসাবুহা জবামি-দাতাও ওয়া হিয়া তামররু মারয়াস্ সাহাবাছুন্ আল্লাহি-ল্লাজি আত্‌কানা কুল্লা শাইয়েন ; ইন্নাহু খাবিরুম্ বিমা তাফ্‌য়ালুন।"

অর্থাৎ, "এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে তখন আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূ-মণ্ডলে যাহা

তামিদা—মাইদ শব্দ হতে উৎপত্তি। ক্রিয়া অর্থ (১) মহা আলোড়ন, (২) প্রচণ্ড কম্পন, (৩) দ্রুতগতি, (৪) ঘূর্ণন।

সূরা লোকমান, সূরা আম্বিয়া ও সূরা নমল প্রভৃতি সূরায় এ শব্দ-গুলো ব্যবহৃত হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে যে পাহাড়রূপ কীলক দ্বারা পৃথিবীর কম্পনকে স্তব্ধ করা হয়েছে ; হাদিস শরীফে এর পূর্ণ বিবরণ দেঐয়া হয়েছে।

টীকা ৫। মাহদান : অর্থ বাসস্থান ও দোলনা।

৬। কারাবান : অর্থ শয্যা, বাসস্থান।

অনেকেই মাহদান-এর অর্থ বাসস্থান না ধরে দোলন বলে উল্লেখ করেছেন। দোলনা যেমন শূন্যে ঝুলে থাকে তেমনি পৃথিবীও দোলনার ন্যায় ঝুলে আছে। কিন্তু যারা 'পৃথিবী ঘোরে' এরূপ আয়াত কোরআনে পায় না তারা 'মাহদান' শব্দটির অর্থ দোলনা না বলে আর একটু বাড়িয়ে **'নাগরদোলা'** করে ফেলেছেন এবং কেন্দ্র বিন্দুর ওপর ঘুরিয়ে আহ্নিক গতির প্রমাণ দেবার অপচেষ্টা করেছেন। নাগরদোলার অর্থ করে যদি পৃথিবীর গোলাকার আকৃতিকে বোঝাতেন তাহলে কিছুটা সার্থক হতো। কিন্তু সমস্ত চিন্তাশীল মনীষীদের ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক ঘোষণা করে এর পাণ্ডিত্য জাহির করার যেমন প্রয়াস পেয়েছেন তেমনি হাদিস ও কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারও জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। পাঠকবৃন্দকে তাই এর অর্থ যাচাই করতে অনুরোধ করি।

আছে তাহারা সকলেই আতঙ্কিত হইবে এবং তাহারা সকলে তাহারই সমক্ষে বিনতভাবে উপস্থিত হইবে। এবং **তুমি পর্বতমালাকে অবলোকন করিয়া উহাদিগকে অচল ধারণা করিতেছ পরন্তু উহারা গতিশীল মেঘমালার ন্যায় প্রধাবিত হইবে**। ইহা সেই আল্লাহরই শিল্প নৈপুণ্য—যিনি প্রত্যেক বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয়ই তিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।"

ওপরে বর্ণিত বাণীসমূহ দিব্যজ্ঞান দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে **বর্তমানে পাহাড় অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে** কিন্তু যেদিন (অর্থাৎ বিশ্ব ধ্বংসের দিন) আল্লাহ পাক আদেশ করবেন সেদিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই উৎক্ষিপ্ত হবে আর পাহাড়সমূহ মেঘমালার ন্যায় প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকবে।

যারা ভবিষ্যতের ঘটনাকে বর্তমান কালের মধ্যে এনে পাহাড়কে গতিবেগ দিয়ে পৃথিবীকে ঘুরিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছেন তাদের বিশ্লেষণ যে কেমন ভ্রমাত্মক, মিথ্যা, অযৌক্তিক ও কাল্পনিক—চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দ একবার তা বিচার করুন। এরা কোরআনের অর্থ বিকৃত করে নিজেদেরকে নাস্তিক বলে প্রমাণ করছেন।

দিবা-রাত্রি ও ঋতু পরিবর্তন

সূর্যের গতিবিধি আমরা দেখলাম। কোরআনের এরূপ সুস্পষ্ট বাণী পেয়ে আমাদের আর সন্দেহের অবকাশ থাকল না যে সূর্য এক অনন্ত আবাসের দিকে দৌড়াচ্ছে অথবা স্থির। পৃথিবী স্বীয় কক্ষে আবর্তন করার ফলেই দিবা-রাত্রি হচ্ছে এরূপ ধারণাও আমাদের আর থাকল না। কেননা কোরআন প্রমাণ করল পৃথিবী স্থির।

সূর্য যদি ঘূর্ণনশীল না হতো অথবা একই দিকে দৌড়াত তাহলে আল্লাহ পাক পূর্বদিকে সূর্যের উদয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাবার কথা বলতেন না। 'মাশরেক' ও 'মাগরেব'—'মাশরেকায়নে' ও 'মাগরেবাইনে'—শব্দগুলোরও কোনই অর্থ হতো না।

চন্দ্র সূর্যের ঘূর্ণনের ফলেই যে দিবা-রাত্রি হচ্ছে ও ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে কোরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উহার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সূরা রহমান

[আয়াত ৫]

"ওয়াশ্-শাম্ছু ওয়াল, ক্বামারু বে হুসবান্।"

অর্থাৎ, "চন্দ্র ও সূর্য গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।"

এখান থেকে বোঝা যায় যে সূর্য ও চন্দ্র এমনভাবে ঘুরছে যার ফলে দিবা-রাত্রি হচ্ছে এবং মানুষ এই পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে দিন, মাস, বছর গণনা করতে পারছে। বাস্তব দৃষ্টিতেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। কিভাবে তা সম্ভব হচ্ছে আল্লাহ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত বাণীতে দিচ্ছেন।

সূরা ইউনুস

[১১ পারা : আয়াত ৫]

"হুয়াল্লাজি জায়ালান্-শামছা দি-আন্ ওয়াল্ ক্বামারা নুরাও ওয়া ক্বাদ্দারাহু মানাজিলা লি তা-লামু আদাদা-ছিনা ওয়াল হিসাবা : মা-খালাকাল্লাহু জা'লেকা ইল্লা-বিল্ হাক্কে ; ইউ-ফাচ্ছি-লুল আইয়া-তি লিকাউমি ইয়ালামুন।"

অর্থাৎ, "তিনিই সূর্যকে জ্যোতির্ময় এবং চন্দ্রকে কিরণময় করিয়াছেন এবং **তন্নিমিত্ত কক্ষায়নসমূহ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা বর্ষের গণনা ও সংখ্যা** অবগত হইতে পার ; আল্লাহ ইহা সত্যভাবে ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই ; **তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছেন।**"

বিভিন্ন কক্ষের ওপর চন্দ্রের পরিক্রমণের ফলে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, মাস, তিথি প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে আসে এবং আমরা এ হিসাবেই চান্দ্র বছরের বিভিন্ন মাস গণনা করে থাকি।

সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বারবার আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। আর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য ঋতু পরিবর্তন ঘটছে।

ওপরে বর্ণিত সূরা রহমান ও সূরা ইউনুস ছাড়াও আরও কয়েক স্থানে এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের জন্য এগুলো উপহার। দেখুন পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির জন্য দিবা-রাত্রি ও ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, না চন্দ্র-সূর্যের ঘূর্ণনের জন্য এ ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে ?

সূরা আন্-আম
[৭ পারা : আয়াত ৯৬]

"ফালেকুল ইসবাহি ওয়া জায়ালাল্ লাইলা ছাকানাউ ওয়াশ্ শামছা ওয়াল্ ক্বামারা হুসবান ; জালেকা তাম্‌দিরুল আজিজিল আলীম।"

অর্থাৎ, "তিনিই প্রভাতের উন্মেষক, এবং তিনি রজনীকে বিশ্রামাগার এবং **সূর্য ও চন্দ্রকে কাল সংখ্যা নির্দেশক করিয়াছেন,** ইহাই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।"

আল্লাহ স্বয়ং তাঁর মহাবাণীর বিশ্লেষণকারী। এমন সহজ, সরল ও স্বচ্ছ বিশ্লেষণের পরেও কি কোন মুমেন ব্যক্তি বলবেন যে পৃথিবী নাচে, দোলে, দৌড়ায় ও বছরে দুবার ডিগবাজী খায়, তাই দিবা-রাত্রি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

চন্দ্র-সূর্যই কাল সংখ্যার ও ছায়া সম্প্রসারণের জন্য দায়ী, পৃথিবী নয়। স্থির বস্তুর চতুর্দিকে অথবা ডাইনে বামে যদি কোন আলোকবস্তু ঘোরানো বা সরানো যায় তাহলে ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া সংকোচন ও সম্প্রসারণ হয়। এ ছায়াকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ এর পরিবর্তন লক্ষ্য করেই আমরা অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান করে থাকি। পদার্থবিদ্যার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ। পৃথিবীর উপরিস্থিত প্রতিটি বস্তুর ছায়াকে আমরা এক অবস্থায় দেখি না। কোন সময় ছোট, কোন সময় বড়, কোন সময় সরু বা বিস্তৃত অবস্থায় দেখতে পাই। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরলে এর উপরিস্থিত বস্তুসমূহের ছায়ার এমন পরিবর্তন ঘটত না। পৃথিবীর চতুর্দিকে সূর্যের পরিক্রমণের জন্যই এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে। কোরআন এ কথার পরিষ্কার বিশ্লেষণ দিয়ে আমাদের মতো মূঢ়দের ভ্রম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে।

সূরা ফোরকান
[আয়াত ৪৫]

"আলাম তারা-ইলা রাব্বিকা কায়ফা মাদাজ্জিলা ওয়ালাও শা-আ-লা-জায়ালাহু ছাকিনা ; সুম্মা জায়াল্‌না শামছা আলায়হি দালিলা।"

অর্থাৎ, "তুমি কি স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে তিনি কিরূপে ছায়া সম্প্রসারণ করেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি উহাকে স্থির করিয়া দিতেন, **অনন্তর আমি সূর্যকে উহার উপর পথ নির্দেশক করিয়া দিয়াছি।"**

আলোর ঠিক বিপরীত দিকে ছায়া পড়ে। সূর্য যখন পূর্বদিকে থাকে—ছায়া তখন পশ্চিমদিকে থাকে। আর সূর্য পশ্চিমে থাকলে ছায়া থাকে পূর্বদিকে। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে ছায়া তখন পায়ের নিচে যায়। সূর্য উত্তরদিকে সরে গেলে ছায়া দক্ষিণ দিকে যায়। আবার দক্ষিণদিকে গেলে ছায়া উত্তরদিকে যায়। ওপরে উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই যে ছায়ার এ গতিবিধি সম্প্রসারণ ও সংকোচন নীতি সম্পূর্ণই নির্ভর করে সূর্যের ওপর। সূর্যের গতিবিধিকেই ছায়া অনুসরণ করে। অন্য কোন বস্তুকে নয়। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি উক্ত কথাগুলো নিশ্চিত করে।

সূরা ফোরকান
[১৯ পারা : আয়াত ৬১]

"তাবারাকাল্লাজি যায়ালা ফি সামা'য়ে বুরুজাও—ওয়া জায়ালা ফিহা ছেরাযাও ওয়া ক্বামারা মুনিরা। ওয়া হুয়াল্লাজি যায়ালাল্ লাইলা ওয়া ন্নাহারা খিল্‌ফাতাল্লে-লেমান আরদা আই-য়াজ-জাক্কারা আও আরাদা শুকুরান।"

অর্থাৎ, "তিনিই কল্যাণময়—যিনি নভোমন্ডলের নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে প্রদীপ্ত সূর্য ও সমুজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি পর্যায়ক্রমে রজনী ও দিবসকে তাহারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—যে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করে অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে।"

এখান থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের গতিবিধিই আলোক ও ছায়া অর্থাৎ দিবা-রাত্রির কারণ। পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য নয়। সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপর আলোকদান করে তখন দিবস হয় আর পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অর্থাৎ আমেরিকায় যখন এর ছায়া পড়ে তখন তাদের হয় রাত্রি। এটা সূর্যের খেলা। এমন অপূর্বলীলা হৃদয়ঙ্গম করতেই এজন্য

জ্ঞানীদের আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার পরেও যারা বলে পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য আলোক-ছায়া অর্থাৎ দিবা-রাত্রি হচ্ছে তারা ভ্রান্ত পথের পথিক, আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

সূরা নাহাল
[আয়াত ৪৮-৪৯]

"আওয়ালাম ইয়ারাও ইলা মা খালাকাল্লাহু মিন শাইয়ে ইয়াতাফাই ইয়াও যিলালুহু আনেল ইয়ামিনে ওয়াশ্ শামায়েলে সুজ্জাদাল্লাহে ওয়াহুম দা-খেরুণ। ওয়া লিল্লাহে ইয়াছ্ জুদু মা ফি সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদ্বে মিন দাব্বাতেও ওয়াল মালায়েকাতু ওয়াহুম লা ইয়াছতাকবেরুণ।"

অর্থাৎ, "তবে কি তাহারা আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে উহাদের প্রতিচ্ছায়া দক্ষিণ ও বাম দিকে পতিত বিনীতভাবে আল্লাহকে সেজদা করিতেছে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত জীবজন্তুসমূহ ও ফেরেশ্তাগণও আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে এবং তাহারা অহঙ্কার করে না?"[১]

যে সব জটিল প্রশ্ন আমাদের মস্তিষ্কে দিবা-নিশি ঘুরপাক খেত এবং সুযোগ-সন্ধানী চিন্তাবিদদের অপব্যাখ্যা বিরাট এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত, তার অবসান করল আল্লাহর পবিত্র বাণী। **চন্দ্র, সূর্য ঘূর্ণনশীল এবং পৃথিবী স্থির**—এ মহাসত্যের দ্বারও উদ্ঘাটিত হলো। তবুও একটা প্রশ্ন হয়ত আসতে পারে যে, বিশ্বের কোন্ বস্তুকে কেন্দ্র করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সবাই ঘুরছে এবং আটকিয়ে আছে? দেখি এর জবাব মেলে কি না।

টীকা ১। সেজদা—আয়াতটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদা দিতে

পৃথিবীই এ বিশ্বের কেন্দ্র

যুগ যুগ ধরে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি পৃথিবী-কেন্দ্রিক, আর একটি সূর্য-কেন্দ্রিক। ধর্মগ্রন্থসমূহ সাক্ষ্য দেয় পৃথিবী এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই এর সেবক। সবাই এ পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। মুসলিম, অমুসলিম পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরাই এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক **'আল্-বেরুনী'**[১]—যার দানে করেছে এর দেহের আর সেবা করছে তারই কোলের সৃষ্ট জীবকে। কোরআন সে কথারও সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের চেতনা এনে দিল।

সূরা ইব্রাহিম

[আয়াত ৩৩]

"ওয়া ছাখ্ খারা লাকুমুশ্-শামছা ওয়াল্ ক্বামারা দাইবাইন।"

অর্থাৎ "এবং তোমাদের জন্য তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে ঘূর্ণনশীল কর্মে নিয়োজিত করেছেন।"

সূরা সাফ্‌ফাত

[আয়াত ৬]

"ইন্না জাইয়েন্না সামাওয়াত্ দুনিয়া বেজিনাতে নিল্ কাওয়াকিব।"

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর আকাশকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"

টীকা ১। আল্-বেরুণী : একাদশ শতাব্দীর ভাস্করদীপ্ত প্রতিভা যে সব বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের আগমনে পৃথিবী ধন্য হয়েছে, আল্‌বেরুণী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সর্ব বিষয়ে এমন অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক আর দেখা যায় না। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, পদার্থ-বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিয়েই আজ সভ্য জগৎ গৌরবান্বিত।

সূরা লোকমান
[আয়াত ২০]

"আলাম্ তারাও আন্নাল্লাহা ছাখ্-খারা লাকুম্, মা-ফি সামা-ওয়াতি ওয়া মা-ফিল আরদ্বি ওয়া আছবাগা আলায়কুম নিয়ামাহু জাহিয়াতাও'ওয়া বাতিনাতা, ওয়া মিনান্নাছে মা-ইউ জবাদিলু বেগাইরে ইল্মেন ওয়ালা হুদাও ওয়ালা কিতাবিম মুবিন।"

অর্থাৎ "তোমরা কি দেখিতেছ না যে—নভোমণ্ডলে যাহা ও ভূ-মণ্ডলে যাহা আছে, **তাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন** এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন ; এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে যে—আল্লাহ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান অথবা উপদেশ কিংবা সমুজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতীত বিতর্ক করিয়া থাকে।"

সূরা ইব্রাহিমে বলা হয়েছে—"তোমাদের জন্যই চন্দ্র সূর্যকে ঘূর্ণনশীল কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে।"

সূরা লোকমানে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "নভো-মণ্ডলে যা আছে এবং ভূ-মণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন।" "তোমাদের জন্য"—অর্থাৎ "সমগ্র মানব জাতির জন্য। তার আবাসস্থল এ পৃথিবীর জন্য। নভোমণ্ডলে যা আছে অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু, আকাশের যাবতীয় বস্তু যারা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে এবং এরই আকর্ষণের আওতায় থেকে মানুষেব সেবা করছে।"

সূরা সাফ্‌ফাত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে যে আমাদের আবাসস্থল এ পৃথিবীকে প্রদীপপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে আর সূরা লোকমান জানিয়ে দিচ্ছে যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকেই আমাদের আয়ত্তাধীন করা হয়েছে ; আমরা কারো আয়ত্তাধীন নই। এটাই যখন সত্য ও সঠিক প্রমাণিত বলে মেনে নিচ্ছি যে আল্লাহর লক্ষ্যবস্তু এই মানুষ, তখন এটাও ধ্রুব সত্য বলেই মানতে হবে যে, **মানুষের বাসস্থান এ সুন্দর পৃথিবীও এ মহাবিশ্বের কেন্দ্র।**

যে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন কয়েক শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদের মাথায় লাথি মেরে তার মৃত্যু ঘটালো, চলুন, সেই কোরআনের অলৌকিক বাণীর সত্যতা আমরা নিজেরাও একবার দেখি এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির আস্তিক-নাস্তিক ভাই-বোনদেরও দেখাই। যদি তাদের জ্ঞান ফিরে আসে, বিশ্বাস এবং ভক্তিতে মাথা নত করে ঐ সর্বকাল দ্রষ্টা এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর কাছে, আর তাঁর মহাবাণী মেনে নেয় তবে তাদেরও পথ হবে সহজ, সরল এবং উন্মুক্ত।

কোরআনের সত্যতা

কোরআন আল্লাহর বাণী ; একথা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানই দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করে। মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতিও স্বীকার করে এবং করেছে যে, কোরআন মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ হ'তে পারে না। কেননা, মানুষের চিন্তাধারায় যথেষ্ট ভুল ত্রুটি থাকে। তাই যুগে যুগেই সে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কোরআনের নির্ভুল বাণী প্রতিটি যুগে প্রতিটি জাতির জন্যই সঠিক পন্থা নিরূপিত করে। এ বাণীর মধ্যে কোন ভুল নেই, কোন সন্দেহ নেই, কোন অবাঞ্ছিত কথা নেই। আছে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কলুষ কালিমার ঔষধ। আছে মানব-দানবের মুক্তি পথের সন্ধান। আছে সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক তত্ত্ব নিহিত। জ্ঞানের পরিসীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, জটিল প্রশ্নের সমাধান যেখানে মিলে না ; বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানেই প্রয়োজন এই ঐশী বাণীর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারমাত্মিক প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের সমাধানও করেছে এই কোরআন। উপরন্তু দিয়েছে. মানব মনের চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে অজস্র বৈজ্ঞানিক সূত্র। আল্লাহ এর সাক্ষ্য বহন করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে।

১। "সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরআন।"

[সূরা ইয়াছিন, আয়ত ২]

২। "সাক্ষী এই সদুপদেশপূর্ণ কোরআন।

[সূরা সাদ, আয়াত ১]

৩। "নিশ্চয় আমি মানবগণের জন্য এই কোরআন হইতে সর্ববিধ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা স্মরণ করে। এই আরবী কোরআনে কোনই ভুল-ত্রুটি নাই যেন তাহারা সংযত হয়।"

[সূরা জোমর, আয়াত ২৭ ও ২৮]

৪। "ইহা (কোরআন) লোকদের জন্য সঠিক ঘোষণা এবং পুণ্যবানদের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও উপদেশ।"

[সূরা আল এমরাণ, আয়াত ১৩৮]

৫। "ইহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতমালা"

[সূরা লোকমান, আয়াত ২]

কোরআনের তথ্যবহুল বৈজ্ঞানিক সূত্র আমার "বিজ্ঞান না কোরআন ?" পুস্তকে দেখিয়েছি এবং আলোচনা করেছি। সেখানে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে কোরআন শুধু মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থই নয়—এর মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল জাতির জন্য অসংখ্য নিদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র যেগুলো বিশ্লেষণ করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় পেঁছিতে পারে।

কোরআনের অসংখ্য বাণী প্রমাণ করে যে এর মধ্যে কোন ভুল নেই, কোন সন্দেহ নেই। এটা মানব-দানবের রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করলাম।

১। "ইহা ঐ গ্রন্থ যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই ; ইহা ধর্মভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক।" [সূরা বকর, আয়াত ২]

২। "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই গ্রন্থ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।" [সূরা সেজদা, আয়াত ২]

৩। "এই আরবী কোরআনে কোন দোষ-ত্রুটি নাই—যেন তাহারা সংযত হয়।" [সূরা জোমর, আয়াত ২৮]

৪। "আচ্ছা তাহারা কি চিন্তা করে না কোরআন সম্বন্ধে? যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারাও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা ইহার মধ্যে নিশ্চয় অনেক অমিল ও গরমিল কথা পাইত।"

[পঞ্চম পারা ঃ সূরা নেসা, আয়াত ৮২]

যারা কোরআনের বাণী আল্লাহর বাণী নয় বলে ধারণা পোষণ করে তাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েই আল্লাহ বলেছেন ঃ

"এবং আমি আমার সেবকের প্রতি যাহা অবতরণ করিয়াছি, যদি তোমরা তাহাতে সন্দিহান হও তবে তৎসদৃশ্য একটি 'সূরা' আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের সাহায্য-কারীকে আহ্বান কর।" [সূরা বকর, আয়াত ২৩]

"বল যদি সমস্ত মানুষ ও জিন এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় যে এইরূপ কোরআন তৈয়ার করিবে তথাপি তাহারা ইহার ন্যায় তৈয়ার করিতে পারিবে না যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।" [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৮]

যারা কোরআনের এই মহাসত্যের বাণী অবিশ্বাস করবে তাদের বুঝাবার কোন ভাষা আমার নেই। তবে তাদের প্রতি একটা অনুরোধ, তারা যেন একথা চিন্তা করেন—যে নবীর মুখ থেকে মহা বাণীগুলো নিঃসৃত হয়েছিল তিনি স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেননি। লেখাপড়া শিখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। অথচ ভাষা, ভাব, অর্থ সবগুলোর সমন্বয় রেখে কিভাবে হাজার হাজার নির্ভুল ও সদুপদেশপূর্ণ বাণীমানব সম্মুখে তুলে ধরলেন। সে যুগে আরবের খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত এই বাণীতে মুগ্ধ হয়েই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এ বাণী রসুলের নিজস্ব বাণী নয়। এ তত্ত্ববহুল বাণী অদৃশ্য কোন মহাশক্তির ইচ্ছাতেই তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা এই বাণী ভক্তিভরে বিশ্বাস করে পথ ধরেছে তারাই সুপথগামী হয়েছে। বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাদেরই হৃদয় আলোকিত হয়েছে। তারাই এ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আর যারা বিশ্বাস করেনি তাদের

পরিণাম কি হয়েছে ইতিহাস তারও সাক্ষ্য আমাদের দিয়েছে। অবিশ্বাস করে তাদের কোন লাভ হয়নি বরং তাদের আত্মাকে কলুষিত করেছে আর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গেছে এক অভিশপ্ত ইতিহাস। এ ছাড়া পরকালের বিচারে যে ফল তারা পাবে সেটা স্পষ্ট করেই কোরআন বলেছে ঃ

"এবং যদি তুমি তাহাদের দেখিতে যখন তাহাদিগকে দাঁড় করানো হইবে আগুনের ভিতর তখন তাহারা বলিবে হায় ! হায় ! আমাদের যদি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠান হইত তবে আমরা আমাদের প্রভুর আয়াত সকল অমান্য করিতাম না এবং আমরা মোমেনদের দলভুক্ত হইতাম।" [পারা ৭ ঃ সূরা আল আনয়াম, আয়াত ২৭]

"যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা জানিয়েছে এবং অহঙ্কার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হইবে না এবং তাহারা বেহেস্তেও প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না, উট ঢুকিতে পারে সূঁচের ছিদ্রে এবং এরূপেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিয়া থাকি।"

[রুকু ৫ ॥ সূরা আরাফ, আয়াত ৪০]

"যাহারা তাহাদের ধর্মকে খেলা তামাশার জিনিস করিয়াছিল এবং এই দুনিয়ার জীবন যাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল। কাজেই আজ আমি তাহাদের কথা ভুলিব যেমন তাহারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলিয়াছিল এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল।" [পারা ৮ ঃ রুকু ৬ ॥ সূরা আরাফ, আয়াত ৫১]

আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী দেখা যায়। বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল আছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। তাঁর বাণীর প্রতিও ভক্তি রাখেন কিন্তু সত্যকে তুলে ধরবার ক্ষমতা রাখে না। লোকে কি বলবে এই ভয়েই এরা পিছপা হন।

এ ধরনের লোককে প্রকৃত ঈমানদার বলা চলে না। কেননা সত্যের কথা নির্ভয়ে তুলে ধরাই ঈমানদারী; তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। যাদের এ বিশ্বাস এবং সৎ সাহসের অভাব তারা মানব

সমাজেও যেমন নিন্দনীয় আল্লাহর কাছেও তেমনি অপছন্দনীয়। আল্লাহ তাঁর বাণীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

"আমি যে সমস্ত নিদর্শন ও উপদেশ নাজেল করিয়াছি আমি মানুষের জন্য তাহা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও যাহারা ঐ সকল গোপন করে তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীও অভিসম্পাত করিবে।"

[সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৯]

আর এক প্রকারের বিশ্বাসী আছেন যারা প্রকৃতই বিশ্বাসী কিন্তু আল্লাহর বাণী ভুল প্রচার করলে পাপ হবে এই ভয়েই সত্য বলতেও ভয় পান। এ ধরনের বিশ্বাসী শ্রদ্ধার পাত্র তবে আল্লাহর বাণীকে গোপন রাখাও অন্যায়, এ কথা জেনে জ্ঞানী এবং বিদ্বানের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকৃত অর্থ বুঝা উচিত এবং নির্ভয়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করা উচিত। সত্যকে সত্য জেনে চুপ থাকা অপরাধ। কোরআন এ কথাও বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঃ

"অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের কথা মানিও না বরং কোরআনের বলে শক্তিশালী হইয়া তাহাদের সহিত কঠিন সংগ্রাম কর।"

[সূরা ফোরকান, আয়াত ৫২]

এবারে অবিশ্বাসীদের কথা বলছি। এক প্রকারের অবিশ্বাসী দেখা যায় যারা কিছুই জানে না, বোঝে না অথচ জ্ঞানীদের কথা বিশ্বাস করে না। এ ধরনের অবিশ্বাসী সমাজের জন্য ক্ষতিকারক ও কলঙ্কজনক। আর এক প্রকারের অবিশ্বাসী আছে যারা নিজের প্রমাণ ছাড়া আর কারো প্রমাণেই বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের অবিশ্বাসীদের আমি খারাপ বলছি না। যারা সত্যকেও বিশ্বাস করে না, মিথ্যাকেও বিশ্বাস করে না, তাদের চাইতে এই প্রকারের অবিশ্বাসী অনেক উন্নত। কেননা, তাদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কম থাকে। তবে নেহায়েৎ গোঁড়ামীর জন্য সমাজ উপকৃত হয় কম। আল্লাহর প্রমাণ, আল্লাহর নিদর্শন এবং আল্লাহর বাণীর মধ্যে কোন

ভুল নেই। মানুষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। তার চিন্তাধারা এবং প্রমাণও যে নির্ভুল হবে একথাও বলা চলে না। তাই যে সমস্ত প্রমাণ এবং সিদ্ধান্তে ঘুরপাক খেতে হয় সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন ও প্রমাণের ভিত্তি দেওয়া উচিত। তবেই এ ধরনের অবিশ্বাসীদের অন্তর হবে স্বচ্ছল এবং দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ন।

বাইবেলের প্রমাণ

[জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল]

চন্দ্র-সূর্য যে স্থির নয়, আপন কক্ষসমূহের ওপর ঘুরছে একথা কোরআন যেমন স্পষ্টভাবে বলেছে পূর্বোক্ত আল্লাহর গ্রন্হসমূহেও ঠিক তেমনিভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এসব গ্রন্হের ওপর আমাদের বিশ্বাস আনতেই হবে। নইলে ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আমরা আখ্যায়িত হতে পারব না। কেননা ঈমানের যে সব শর্ত রয়েছে তার মধ্যে পূর্ববর্তী গ্রন্হসমূহের ওপর বিশ্বাস স্হাপন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্হা। আল্লাহ স্বয়ং সে কথা প্রথমেই বলেছেন ঃ

"আলিফ-লাম-মিম। ইহা ঐ গ্রন্হ যাহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই, **ইহা ধর্মভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক**। যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা প্রদান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে ; **এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পুর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে** এবং পরকাল সম্বন্ধে যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ; তাহারাই স্বীয় প্রতিপালকের সুপথে আছে এবং তাহারাই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।"[১] [২ ঃ ১, ৫]

টীকা ১। কোরআন, পারা ১ ঃ সূরা বাকারা, আয়াত ১ হতে ৫।

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম ও ইছমাইল ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মুসা ও ঈসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল **তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি ;** তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করি না এবং আমরা, তাহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"[১] [২ : ১৩৬]

তাই চলুন গোঁড়ামীর আশ্রয় না নিয়ে জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস স্থাপন করি। এসব গ্রন্থে যে ছাটকাট হয়েছে সেগুলো বাদে কোরআনের সঙ্গে যেগুলোর মিল আছে তা মেনে নেই এবং দেখি চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও আকাশ সম্বন্ধে এরূপ বাণী পাই কি না।

সূর্য ঘূর্ণনশীল

১। "সূর্য উঠে আবার অস্ত যায় ; এবং সত্বর স্বস্থানে যায় যেখানে গিয়া উঠে।" [বাইবেল। জবুর উপদেশক ১/৫]

ওপরে বর্ণিত বাণী হতে সূর্যের উদয় ও অস্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যা কোরআনে আমরা দেখেছি। একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সেখান হতে আবার উদিত হবার অর্থ আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে পুনরায় নিজ কক্ষের ওপর পরিক্রমণ করা। এ বাণীটি হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। হাদিছের প্রমাণ পরিচ্ছেদে তা দেখতে পাবেন। যে সব লোক এমন বাণী পেয়েও বলে থাকেন যে 'সূর্য স্থির' অথবা একই দিকে পৃথিবীসহ প্রচণ্ড গতিতে দৌড়াচ্ছে তারা অন্ধ, অপব্যাখ্যাকারী ও বিপথ-গামী। এদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করা পাপ ও নাস্তিকতা। হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র বাণী দেখলে আমার এ কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

টীকা-১। কোরআন, পারা ২ : সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৬।

পৃথিবীর কক্ষে পর্বতমালা সংস্থাপন করে আল্লাহ কিভাবে পৃথিবীকে স্থির করে দিলেন, নড়াচড়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন কোরআন থেকে আমরা তা দেখেছি। হাদিছ পরিচ্ছেদে পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ আবার তা দেখতে পাবেন। এর পূর্বে বাইবেল থেকেও বাণীগুলির উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"যখন তিনি ঊর্ধ্বস্থ আকাশকে দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিলেন ; যখন জলাধার প্রবাহরাশি প্রবল হইল ; যখন তিনি সমুদ্রের সীমা স্থির করিলেন যেন জল তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে ; **যখন তিনি পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন।**"[১]

বৃক্ষের মূল যেমন বৃক্ষটিকে স্থির রাখে দৌড়াদৌড়ির হাত থেকে রক্ষা করে তেমনি পৃথিবীর মূল এ পাহাড় পৃথিবীকে স্থির রেখেছে, নড়চড় করতে দিচ্ছে না। কোরআনের সূরা লোকমান, সূরা নাহাল ও সূরা নবাতে ঐ মূল খুঁটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে উল্লিখিত ও হাদিছে বর্ণিত '**রাওয়াসিয়া**' এর অর্থও মূল খুঁটি, কীলক, পাহাড় ইত্যাদি।

কোরআন ও বাইবেল যেখানে একই ভাষায় ঘোষণা করল '**পৃথিবী স্থির**' সূর্য ঘোরে সেখানে কোন্ সে নাস্তিক যিনি বলেন— সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘোরে, অথবা চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সবই ঘোরে ?

২। "সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত অসুস্থ ও মন্দ আত্মা বিশিষ্ট লোককে তাহার নিকট আনিল।"[২]

এ বাণীও সূর্যের উদয় ও অস্তেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরূপ বাণী ধর্মগ্রন্থসমূহে অসংখ্য মিলে।

টীকা ১। বাইবেল জবুর—হিতোপদেশ পরিচ্ছেদ ৮/২৯।
২। বাইবেল—মার্ক সুসমাচার। ৩২-৩৩।

পৃথিবী স্থির

(ক) "এক পুরুষ চলিয়া যায় আর এক পুরুষ আসে ; কিন্তু পৃথিবী নিত্য স্থায়ী।"[১]

(খ) "আর জগৎ-ও অটল তাহা বিচলিত হইবে না।"[২]

(গ) "জগৎ-ও সুস্থির, তাহা নড়চড় করিবে না।"[৩]

(ঘ) "তিনি শূন্যের উপরে উত্তর কেন্দ্রে বিস্তার করিয়াছেন। অবস্তুর উপরে পৃথিবীকে ঝুলাইয়াছেন।"[৪]

(ঙ) "তোমার বিশ্বস্ততা স্থায়ী। তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছ এবং তাহা স্থির রহিয়াছে।"[৫]

(চ) "তিনি পৃথিবীকে তাহার ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করিয়াছেন। তাহা কস্মিনকালেও বিচলিত হইবে না।"[৬]

বেদের প্রমাণ

একমাত্র উপাস্য ঐ সৃষ্টিকর্তা যিনি ঃ

১। "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ় যেন স্ব স্তাভিতং যেন নাকঃ। যোহন্ত রিক্ষে রজৎসা বিমানঃ ...।"

[ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০। সূত্র ১২১/৫ম]

অর্থ ঃ "তেজস্কর দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহার দ্বারা স্থির (দৃঢ়) রহিয়াছে যেন স্ব-স্থান হইতে নড়চড় না করে। সূর্যকে

টীকা ১। বাইবেল। জবুর—উপদেশক পরিচ্ছেদ ১/৪, পৃষ্ঠা ৯৯৫ [বাংলা তর্জমা]

২। ঐ ঐ গীত সংহীত ৯৩/১

৩। বাইবেল। জবুর—ঈশ্বরের প্রশংসার্থক গীত পরিচ্ছেদ। ১ম বংশাবলী, পৃষ্ঠা ৬৪৭ [বাংলা তর্জমা]।

৪। ঐ—ইয়োবের শেষ উত্তর। ২৬/৭ [বাংলা তর্জমা]

৫। বাইবেলের জবুর—গীত সংহীতা ১১৯/৯০ পৃষ্ঠা ৯২৭ [বাংলা তর্জমা]

৬। ঐ ঐ ১০৪/৫ ঐ

যিনি তাহার কক্ষে ধারণ করিয়া আছেন ; যিনি মুক্তিদাতা, যিনি অনন্ত শূন্যে লোক লোকান্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী।"

চলুন দেখি, পৃথিবী স্থির সম্বন্ধে বেদে এরূপ বাণী আরও মিলে কিনা।

২। "সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্না—দণ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং ; হত।"[১]

অর্থঃ "সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা (পর্বতমালার দ্বারা) **পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন**—তিনি বিনাখুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়রূপে ধারণ করেছেন।"

৩। "যো অক্ষেনেব চ ক্রিয়া শচীভি-বিষ্বক ত স্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম।"[২]

অর্থঃ "সে ইন্দ্র নিজ শক্তি দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন।" (যেন নাক ঃ অর্থাৎ নড়চড় না করে প্রথম বাণীতে বলা হয়েছে।)

৪। "ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।"[৩]
অর্থঃ "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল।"

ওপরে বর্ণিত বাণীসমূহ কোরআনের বাণীসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণই মিল রয়েছে। সূরা রূম, সূরা ফাতের, সূরা লোকমান, আম্বিয়ার পবিত্র বাণীগুলো দেখুন। শব্দগুলোর মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। শুধু দুটো শব্দ আকাশ ও পৃথিবী নিয়েই বার বার কোরআনের মতই দেখানো হয়েছে যে এ দুটো স্থির হয়ে আছে। অনড়, অটল ও চিরস্থায়ীরূপে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অবস্থার প্রেক্ষিতেই এর পরিবর্তন ঘটছে না। পর্বতমালা কীলক স্বরূপ পৃথিবীর বক্ষে স্থাপন করার

টীকা ১। ঋগ্বেদ। দশম মণ্ডল ১৪৯/১
২। —ঐ—। —ঐ ৮৯/৪
৩। —ঐ— ১৭৩/৪

ফলেই পৃথিবী নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে। সর্ব ধর্মগ্রন্থ একই ভাষায় এর সাক্ষী দিচ্ছে। এটা বিজ্ঞান সম্মতও বটে। মহাবৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রমাণসিদ্ধ যুক্তিপূর্ণ বাণীতেও একথা বলা ভ্রান্ত ও অলীক চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন।

দেখুন, বেদে কি সুন্দর উপমা দিয়ে পর্বতমালা নিশ্চলতা প্রমাণ করেছে এবং এর স্বরূপ বর্ণনা করেছে।

৫। "ধ্রুবা এব বঃ পিতর যুগে যুগে ক্ষোমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।"[১]

অর্থঃ "আমাদের পিতাস্বরূপ পর্বত যুগ যুগান্তর ধরে স্থির আছে। তারা পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না।"

পাহাড়-পর্বতমালা স্থানচ্যুত হলে পৃথিবী স্থির থাকত না। দোদুল্যমান (unbalanced) হয়ে যেত। মুহূর্তে মধ্যে এক প্রলয় কাণ্ড ঘটত। জীবজন্তুর বাসস্থানের উপযুক্ত থাকত না। কোরআনে বহুবার একথা বলা হয়েছে। পিতার আশ্রয়ে পুত্রেরা যেমন নিরাপদ থাকে তেমনি পর্বতমালা শত বাধা-বিঘ্ন—অতিক্রম করেও যুগ যুগান্তর ধরে অটল হয়ে আছে, পৃথিবীকে স্থির রেখেছে। কম্পন, দোলন, দৌড়াদৌড়ি ও ঘূর্ণনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাই জীবকুল এ পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

টীকা ১। ঋগ্বেদ। দশমমণ্ডল ৯৪/১২

পৃথিবী এ বিশ্বের কেন্দ্র

চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই এ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এ কথা কোরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে বেদেও ঠিক তেমনি বলা হয়েছে। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তারই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বেদের সুন্দর উপমা তারই প্রমাণ। সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"দূতো দেবানামসী মর্ত্যা না মহন্তর্ম হাশ্চরসি রোচনেন ॥[১]
শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ন্তী মাতা বিভর্তি সচনস্য মানা ॥"

অর্থ ঃ "হে সূর্য তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে দীপ্তি বিশিষ্ট হয়ে বিচরণ কর। পৃথিবী যেন তোমার মাতা তুমি যেন তার বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে মায়ার টানে আলিঙ্গন করে।"

চন্দ্র সূর্য ঘূর্ণনশীল

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে কোরআন-হাদিস-বাইবেল-জেন্দাবেস্তার পবিত্র বাণীসমূহ হতে আমরা দেখেছি **চন্দ্র সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে সৃষ্টির পর থেকে অবিরামভাবে ঘুরছে**। এ ঘূর্ণনের পথে এদের কোন বিরাম নেই ; বিশ্রাম নেই, শৈথিল্যতা নেই, সময়ের কমবেশী নেই। এদের ঘূর্ণনের ফলাফলেই দিবা-রাত্রির বিকাশ ঘটছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে নয়। চার হাজার বছর পূর্বের এ ঐশীবাণী বেদ এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। আর পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ-সমূহের বাণী নির্ভুল ও সত্য এ কথাও প্রমাণ করে—যুগ যুগের গবেষক, চিন্তাশীল মনীষী, ধর্মপ্রাণ মানবগোষ্ঠী ও বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষা দেয়।

দেখুন চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি সম্বন্ধে পুরাতন এ পবিত্র বেদ কি সুন্দর বাণী দিয়েছে।

টীকা ১। ঋগ্বেদ। দশমমণ্ডল ৪/২—৩।

১। "সূর্যমাসা বিচরন্তা দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহূষী অস্য বোধতম।" [ঋগ্বেদ। দশমণ্ডল ৯২-১২]

অর্থ ঃ "**হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র!** তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে এর স্তব অবগত হও।"

২। "মাসাং বিধানমদধা—অধি দ্যবি ত্বয়া বিভিনং ভরতি প্রধিং পিতা।" [ঋগ্বেদ ২য় খণ্ড। দশমমণ্ডল ১৩৮/৬]

অর্থ ঃ "হে ইন্দ্র! তুমি আকাশের উপর **চন্দ্রের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছ। সূর্যের রথচক্রকে** যখন বৃত্র ভঙ্গ করে তখন সকলের পিতা আকাশ তোমার দ্বারাই সে চক্র ধারণ করিয়া থাকেন।"

সূর্যের উদয় ও অস্ত

৩। "আয়ং গৌঃ পৃশ্মিরক্রমিদসদন মাতরং পূরঃ।
পিতরং চ প্রযনৎস্বঃ।"

[সামবেদ-সংহিতা। একাদশ অধ্যায় সুক্ত-১১/১৩৭৬]

অর্থ ঃ "এই নানারূপ বিচিত্রবর্ণ **গমনশীল সূর্য** (অগ্নি) প্রথমে পূর্বদিকে উদিত হয়ে পরে আকাশের কক্ষপথে গমন করে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।"

৪। "ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্হাৎ প্রত্যঙচিত্রা বিভ্রদ-সায়ূধানি।" [সামবেদ-সংহিতা। সূক্ত—৯/১৮৪৭]

অর্থ ঃ "রশ্মির ধারক সূর্য (গন্ধবো) আকাশে উন্নতভাবে অবস্হান করে। পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়-বিচিত্র রশ্মির শাণিত রূপ ধারণ করে।"

৫। "ত্বং ত্যমিন্দ্র সূর্যং পশ্চা সন্তং পূরস্কৃধি।
দেবানাং চিত্তিরো বশম্॥"

অর্থ ঃ "যখন রম্যমূর্তি সূর্য পশ্চিম দিকে যায় দেবতারাও দেখতে পান না যে সে কোথায় গেছে তখন তুমি (ইন্দ্র) সে সূর্যকে আবার পূর্বদিকে এনে দাও।"

ঋতু পরিবর্তন

সূর্য ঘূর্ণনের ফলেই যে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে—সূর্যের বার্ষিক গতিই যে এর মূল কারণ তা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত বেদও প্রমাণ করেছে। নিম্নের বাণী এ সাক্ষ্য বহন করে।

১। পশ্যান্ননস্যা অতিথিং বয়ায়া ঋতস্য ধাম বি মিমে পুরূণী।"[১]

অর্থ ঃ "পৃথিবী ভিন্ন আর একটি গমনপথ আছে আকাশ যার অতিথি সূর্য। আমি তাকে লক্ষ্য করে তার বার্ষিকগতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকি।"

২। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম। সমঢ়মস্য পাংসুরে। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অত ধর্মানি ধারয়ণ।"[২]

অর্থ ঃ "বিষ্ণু (সূর্য) এই চরাচর বিশ্ব পরিক্রমণ করেন। এর পদস্হান সুদৃঢ়রূপে অন্তরিক্ষে স্হাপিত; ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন (= উত্তরায়ন বিন্দু—কর্কটক্রান্তি, দক্ষিণায়ন বিন্দু—মকরক্রান্তি বিষুব বিন্দু স্পর্শের দ্বারা এ পৃথিবী পরিক্রমণ করে)।"

একই কথা কোরান, বাইবেল ও বেদে দেখছি আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্হির আর চন্দ্র সূর্য তাদের কক্ষপথে ঘুরছে। চলুন আর একটি ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখি।

টীকা—১। ঋগ্বেদ। দশমমণ্ডল। মন্ত্র ১২৪-৩ [২য় খণ্ড]
২। সামবেদ সংহিতা। সূক্ত-৫। মন্ত্র ১৬৬৯-৭০।
অষ্টাদশ অধ্যায়। অনুবাদক—পরিতোষ ঠাকুর।

জেন্দাবেস্তার প্রমাণ

প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্যই আল্লাহপাক নবী পাঠিয়েছেন। পারস্য দেশেও অনেক নবীর আবির্ভাব হয়েছিল এবং তাঁদের অনেকের উপরই আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিল। জেন্দাবেস্তা কোন্ নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এর প্রমাণ আমি এখনও হাতে পাইনি। তবু এর বাণীগুলো দেখে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে এ গ্রন্থ আল্লাহর প্রেরিত। কেননা আল্লাহর নামেই আরম্ভ করা হয়েছে। প্রতিটি ছন্দই আল্লাহর গুণগানে ভর্তি। তাঁর শক্তি-মহিমা, সৃষ্টির কৌশল ও জয়গানেই হয়েছে শুরু। প্রথম কয়েকটি ছন্দ তুলে ধরছি। পাঠকবৃন্দ এগুলো গভীরভাবে একবার চিন্তা করুন। এরপর চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর স্বরূপ দেখুন।

বঙ্গানুবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।"

১। "তাঁহার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি বিশ্বের রক্ষক, জীবনের স্রষ্টা, বিজ্ঞ রসনাপরী বাক্যের সৃজনকারী।"

২। "বহু দাতা, সাহায্যকারী, বদান্য, পাপ মার্জনাকারী এবং আপত্তি গ্রহণকারী।"

৩। "তিনি এরূপ পরাক্রান্ত যে, যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বার হইতে মস্তক ফিরায় সে যে দ্বারে উপস্থিত হয় কুত্রাপি সম্মান পায় না।"

৪। "গর্বিত মস্তক নরপতিদিগেরই শিরোদেশ তাঁহার সভায় হীনতার ধরায় অবনত হয়।"

৫। "তিনি বিদ্রোহীদিগকে শীঘ্র শাস্তি দেন না কিংবা আপত্তিকারীদিগকে অত্যাচারপূর্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেন না।"

৩৪। "তিনি চন্দ্র-সূর্যকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণকারী করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে জলোপরি বিস্তৃত করিয়াছেন।"

৩৫। "যখন পৃথিবী কম্পজ্বরে কাতর হইয়াছিল, তিনি তাহার প্রান্তে পর্বতরূপে কীলক প্রোথিত করিয়াছিলেন। তখনি পৃথিবী স্থির হইল।"[১]

কোরআন ও বাইবেলে চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধির যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবেই জেন্দাবেস্তাতেও দেওয়া হয়েছে। যদি বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত, উল্টা অর্থ হতো অথবা কোরআন বিরোধী কোন ছোঁয়া পেতাম তাহলে একবাক্যেই আমরা পরিহার করতাম। চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে, পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে এদের যাত্রাপথ, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা আল্লাহর আদেশ পালন করছে একথা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে বাইবেল ও জেন্দাবেস্তা বিশ্বাস করি না—একথা যদি কেউ উচ্চস্বরে ঘোষণা করে তবে সেকি কোরআনকেই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাস করল না? যেখানে তিনটি ধর্মগ্রন্থেই একই কথা সেখানে যে কোনটির বাণী (চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর) অবিশ্বাস করাই কি অন্যগুলোকে অবিশ্বাস করা নয়? পৃথিবীর সৃষ্টির সময় তা কম্পিত হচ্ছিল—পাহাড়কে এর মূল নিরূপণ করে বা কীলক দিয়ে এঁটে দেওয়ার পর স্থির হয়ে বসবাসের উপযোগী হলো এ কথাই তিনটি গ্রন্থ সমন্বয়েই ঘোষণা করছে। এর পরেও যারা বলে পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য সবই ঘোরে তাদের বলতে হবে স্বার্থান্বেষী, মস্তিষ্কবিকৃতকারী চিন্তাবিদ। ধর্মগ্রন্থে তাদের বিশ্বাস নেই।

টীকা—১। "কথিত আছে, ঈশ্বর জলের উপর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। পৃথিবী যখন কম্পিত হইতে লাগিল, তখন ঈশ্বর পৃথিবীর উপর পর্বত সৃষ্টি করেন। '**পৃথিবী স্থির হইল**।"

[বঙ্গানুবাদ ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ, শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাংলাদেশ]।

উপরে উদ্ধৃত জেন্দাবেস্তার বাণীসমূহ যে সত্য তা প্রমাণ করে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত কথাসমূহ। 'আহম্মদ' ও 'মোস্তফা' নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর পদানুসরণ করার নির্দেশ কঠোরভাবে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

৬৫। "এই সমুদ্রে আহ্বানকারী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ গমন করে নাই। যে পশুপালকের পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।"

৬৬। "যাহারা এই পথ হইতে ফিরিয়াছে তাহাদিগকে অনেক পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং অনেক পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছে।"

৬৭। "যে কেহ পয়গম্বরের বিরুদ্ধে পথ আশ্রয় করে, সে কখনও লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইতে পারিবে না।"

৬৮। "হে সাদী! মনে করিও না পবিত্রতার পথে 'মোস্তফার'[১] পশ্চাৎ অনুসরণ ব্যতিরেকে গমন করিতে পারিবে।"

[বঙ্গানুবাদ ডঃ মুহাঃ শহীদুল্লাহ]

"আমি ঘোষণ করিতেছি, হে স্পিথাম জরথুস্ট পবিত্র আহম্মদ[২] নিশ্চয় আসিবেন যাহার নিকট হইতে তোমরা সৎচিন্তা, সৎবাক্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

[১ম পরিচ্ছেদ। অনুবাদ ম্যাক্স মুলার, পৃঃ ২৬০]

এবার চলুন হাদিসের প্রমাণ পরিচ্ছেদে এ পবিত্র আহম্মদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বাণী ধরে দেখি কোরআন, বাইবেল ও জেন্দাবেস্তার সঠিক অনুবাদ চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা দিয়েছি কি না।

টীকা—১। মোস্তফা অর্থ নির্বাচিত। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপাধি।

২। হযরত মুহাম্মদের (দঃ) অন্য নাম। কোরআনে, বাইবেলে এবং বেদেও এ নাম আছে।

হাদিছের প্রমাণ

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) অতীব জটিল, কঠিন চিন্তাধারা যার সমাধান আমরা করতে পারিনি তা আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতিটি বাণী বিজ্ঞান-সম্মত খাঁটি ও নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে[১]। শুধু আমরা মুসলমানরাই নই, বিশ্ব মনীষীরা তাঁর বাণীর অদ্ভুত গুরুত্ব ও গুণাগুণ দেখে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁর মত জ্ঞানী কেউ ছিল না—কেউ হবেও না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাঁর বাণী বিশ্লেষণ করলে আমরা অবাক হয়ে যাই। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। তাই চলুন, এ অমর বৈজ্ঞানিকের মতামত নিয়ে আমরা এ জটিল বিষয়ের এক সর্বশেষ সমাধানে আসি।

সূর্য স্থির নয়, ঘূর্ণনশীল—একথা তিনি স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে।

তিনি বলেছেন —

"খোদার পথে সকালে বা সন্ধ্যায় চলা যাহার উপর সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"[২]

উপরে বর্ণিত বাণী পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে সূর্যের চলার জন্য এক নির্দিষ্ট পথ আছে। সূর্য ঐ নির্দিষ্ট পথেই আপন গতিতে পরিভ্রমণ করে।

সূর্যের অস্ত ও উদয় সম্বন্ধে রছুলের এরূপ বাণী আমরা আরো দেখতে পাই। পরে আরো একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ

টীকা—১। আমার রচিত বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকে এর কিছুটা প্রমাণ পাবেন।

২। সহীহ বুখারী—তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ।

[হাদিছ নং৬/৩৫ পৃষ্ঠা নং ৬৯—৭০।]

আবুযর (রাঃ) বলেছেন—

"নবী (সঃ) আমাকে বলিয়াছেন, 'জান কি কোথায় যায় সূর্য যখন ডুবে?' আমি বলিলাম, "খোদা ও তাঁহার রছুলই জানেন। তিনি বলিলেন উহা যাইতে যাইতে সেজদা করে আরশের নিচে। তারপর অনুমতি চায় (উদয়ের)।"[১]

এবারে দেখি পৃথিবী ঘূর্ণন সম্বন্ধে তাঁর মত কি?

"আন্ শুদুকুম বিল্লাহেল্লাজি বেইজনিহি তাকুমো সামায়ো ওয়াল্ আরদ। হাল্ তায়ালা মুনা জালেকা?"[২]

অর্থাৎ "আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যার হুকুমে **আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্থির হয়ে আছে**। তোমরা তা জান তো?"

এ বিষয়ে রছুলের আর একটি বাণী আমরা পেয়েছি যা নিম্নরূপ—

হযরত আনাস বলেন:

রছুলল্লাহ (দঃ) বলেছেন—"যখন আল্লাহতায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন তখন তাহা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করিলেন এবং উহার উপর শলাকা স্বরূপ মারিলেন। **তখন পৃথিবী স্থির হইল**।"[৩]

সাহাবী আনছা (রাঃ) উক্ত হাদিছটি নিম্নরূপে বর্ণনা দিয়াছেন:

রছুলুল্লাই (দঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ জমিনকে সৃষ্টি করিলেন তখন তাহাতে ভীষণভাবে কম্পন উপস্থিত হইল, তাহা জীবজন্তু ও মানব দানবের অবস্থানের যোগ্যই থাকিল না। সুতরাং

টীকা—১। সহীহ বুখারীর—তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ।

—হাদিছ নং ৬/১৭৭

প্রথম খণ্ড। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃঃ নং ১৭৬—১৭৭।

২। ঐ ঐ [হাঃ নং ১১৪-১৭৭।

জেহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ। পৃঃ নং ১৪৪।]

৩। মেশকাত ও হাদিছে রছুল—কৃত অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী।

আল্লাহ পাহাড় পর্বতগুলিকে সৃজন করিয়া জমিনের উপর বসাইয়া দিলেন আর অমনি জমিন থামিয়া গেল। শান্ত হইয়া স্বস্থানে স্থিতিশীল হইয়া গেল"[১] প্রকৃত বাণীটি এই ঃ

"লাম্মা খালাকাল্লাহুল্ আরদা জায়ালাত তামিদো ফা খালা-কাল জেবালা ফাকালবেহা আলায়হা ফাসতাকাররাত ; ফায়াজে-বাতেল্ মালায়েকাতু মিন্ শেদ্দাতেল্‌জেবালে।[২]"

সূর্যের ঘূর্ণন ও পৃথিবী স্থির সম্বন্ধে আমরা হযরতের (দঃ) মুখনিঃসৃত যে বাণী পেলাম তা থেকে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকল না যে পৃথিবীর কোন গতি আছে। যারা হযরতের এমন বাণী পেয়েও বলবেন যে পৃথিবী ঘোরে তাঁরা শুধু গোঁড়াই নন, ধর্মবিরোধী, বিজ্ঞান বিরোধী ও বিবেকজ্ঞান বিরোধী। যদি কোরআন ও হাদিছ না মানেন তা হলে ধর্মকে মানবেন না, ইসলামকে মানবেন না। কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে চক্রাকারে উলট পালট খান।

পৃথিবী ঘোরে এর উপর যদি কোন বাস্তব প্রমাণ থাকত, ল্যাবরেটরি হতে যদি কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বের করা সম্ভব হতো তাহলে এর উপর যুগে যুগে এ দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলত না। আইনস্টাইনের মত মহাজ্ঞানীও যেখানে পৃথিবী ঘূর্ণনের কথা অস্বীকার করে বললেন, **"পৃথিবী ঘোরে এর কোন বাস্তব প্রমাণ নেই"**—সেখানে যারা বিজ্ঞান চর্চা মোটেই করেন না তাঁরা পৃথিবী ঘোরে এ মতবাদ কোরআন হাদিছের চেয়েও বেশী খাঁটি মনে করে গ্যালিলিওকে দেবতার আসনে বসালেন। ভুল বুঝে ভুল করলে ক্ষমা আছে কিন্তু গ্যালিলিওকে গোঁড়ামীয় মত সমর্থন দিতে গিয়ে আল্লাহ ও রছুলের বাণীর অবজ্ঞা করলে অথবা ভুল

টীকা—১। কিমিয়ায়ে সাআদত—কৃত ইমাম গাজ্জালী ৩য় খণ্ড। দানের পরিচ্ছেদ। তর্জমা মৌলানা নূরুর রহমান, এম. এম.।

২। মিশকাত। হাঃ নং ১৮২৮। তরজমা মৌলানা নূর মুহাম্মদ আজমী।

ব্যাখ্যা দিয়ে বা না বুঝার ভান করে পৃথিবী ঘোরে এ কথা বিশ্বাস করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন কিনা জানি না। কেননা— স্বার্থহীন কণ্ঠে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

"ওয়ালা তাল্ বিছুল হাক্কা বেল্ বাতিলে ওয়া তাক্ তুমুল হাক্কাওয়া আনতুম তায়ালামুন।"

অর্থাৎ "এবং সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং তোমরা সেই সত্য গোপন করিও না—যেহেতু তোমরা উহা অবগত আছ।"[১] [সূরা বকর, আয়াত ৪২]

বিজ্ঞানীদের মতবাদে যারা পাহাড়ের মত অটল, অবিশ্বাসীদের মতো গোঁড়া তাঁরা কি জবাব দেবেন চাঁদের জন্মতত্ত্ব নিয়ে ? চিরকাল বিশ্বাস করে আসলেন পৃথিবী হতে চাঁদের জন্ম হয়েছে। এখন বিজ্ঞানীরা বলছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিশ্বাস করতে হয়তো মন চাইবে না। তবু দেখলেন তো ? বিজ্ঞানীরা চাঁদের জন্ম সম্বন্ধে কি কথা শেষ পর্যন্ত বললেন ? এক খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে একথা এমনি বের হয়ে এলো, "**এতদিন মানুষের যে ধারণা ছিল তা সম্পূর্ণই ভুল।**"

এখন কি বিশ্বাস করবেন ? যারা কোরআন ও হাদিছ বিশ্বাস করেন না তাদের যুগে যুগেই এভাবে নাজেহাল হতে হবে। নিজের বিবেককে নিজের কাছেই জলাঞ্জলী দিতে হবে।

আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস ও আউলিয়াদের মতে

এক : হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবী, সম্রাট, আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, অদৃশ্য বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটক, সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী, আরশ কুরসী, বেহশত-দোজক দর্শনকারী, পার্থিব ও অপার্থিব

টীকা—১। কোরআন ২ : ৪২।

জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী বৈজ্ঞানিক রছুলে করিম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যিনি নিজের পরিচয় দিতে বলেছেন ঃ

(১) "আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।"

(২) "আল্লাহ-পাক আমার অন্তরে এক অনুগ্রহের জ্যোতি নিক্ষেপ করিলেন আর আমি ইহাতে অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম। **নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের** অভ্যন্তরে যা কিছু আছে এর সব তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম।"

(৩) "পূর্বদ্বয় এবং পশ্চিমদ্বয় আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল।"

অন্তর যার বিকশিত, দিব্য-দৃষ্টি যার উদ্ভাসিত ইহ-পারলৌকিক তত্ত্ব যার অবগত, জ্ঞান সমুদ্রে যিনি নিমজ্জিত, তিনিই ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্থির রহিয়াছে।" (হাদিছ পরিচ্ছেদে এ পূর্বে উদ্ধৃত)

শুধু মুসলমানই নয়, বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানবকুল— যাদের এ মহামানবের প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাঁরা এ মহাসত্যের বাণীকে ভক্তিভরেই মেনে নিবেন এ বিশ্বাস আমি করি। যারা গোঁড়ামী করে অবজ্ঞা করবে তাদের পরিণতি কি হবে আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা আল্লাহর বাণী ও রছুলের (দঃ) বাণী অবিশ্বাস করা কতবড় অপরাধ যদি কেউ জানত তাহলে গোঁড়ামী করে নিজের ধ্বংস ডেকে আনত না।

দুই ঃ গাওসে আজম হযরত শেখ মহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)

আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল ভাস্কর এ মহাপুরুষ যিনি স্বীয় মুখ নিঃসৃত বাণীতে বলেছিলেন ঃ

"সকল সিদ্ধ পুরুষের স্কন্ধে আমার চরণ"—তিনি তাঁর অমূল্য গ্রন্থ "গুনিয়াতুত তালেবীন"-এ (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫) আল্লাহর প্রশংসাবাণী ব্যক্ত করতে বলেছেন ঃ

"আর তাহার এবাদত উপাসনায় একনিষ্ঠ ও অনুগত বান্দাদের দ্বারা শহরসমূহকে সুদৃঢ় রাখিয়াছেন—যেমন এই পৃথিবীকে পাহাড়ের দ্বারা সুদৃঢ় ও অটল করিয়া রাখিয়াছেন—যাহাতে ইহা বসবাসের জন্য নিরাপদ হইতে পারে।" [অনুবাদক—নুরুল আলম রইসী এফ. এস. বি. এ. (অনার্স) এম. এ.]

যে মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে সব কিছু হয়েছে উদ্ভাসিত, যাঁর চরণ যুগলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য হাজার হাজার আউলিয়া ঘর সংসার ত্যাগ করেছে, যাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে অসংখ্য মানব ধন্য হয়েছে, যাঁর মহান চরিত্র যুগ যুগের জ্ঞানী বিজ্ঞানী ও তাপসদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর বাণীকে অবজ্ঞা করার সাহস কার ? সেই নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধ যে এমন বাণীকে উপেক্ষা করে বলে 'পৃথিবী ঘুরছে'।

তিন ঃ হযরত আলী (রাঃ)

বিশ্ব ইতিহাসে যে নামটি সুপরিচিত, ইসলামের ইতিহাসে যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আধ্যাত্মিক জগতের আলো হিসেবে যে নামটি সাধক প্রাণে পুলক আনে, বীর যোদ্ধা হিসেবে আজও যাঁর সুনাম জগৎ ব্যাপী, অপরিসীম জ্ঞান ভাণ্ডারে যাঁর হৃদয় ছিল ভর্তি, শক্তি ও সাহসিকতায় যিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হলেন বীর মুজাহিদ, শেরেখোদা হযরত আলী (রাঃ) রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রিয় জামাতা। আল্লাহ যাঁদের ভালবেসে এই পৃথিবীতেই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম রছুলের অতি প্রিয় সহচর।

তিনি হযরত আনাছ কর্তৃক বর্ণিত হাদিছটির (যা হাদিছ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি—যখন আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন……পৃথিবী স্থির হলো)—ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে— "দেহের মাংসপিণ্ড যেমন স্থিতিশীল, নড়চড় করে না তেমনি এ পৃথিবীও স্থিতিশীল নড়চড় করে না।" (তফসীরে তাবারী)।

তাঁর এ উপমা ছিল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের

যুক্তি ও প্রমাণের অপূর্ব খোরাক। আর 'পৃথিবী ঘূর্ণনশীল'—মতবাদীদের মাথায় কুঠারঘাত।

হযরতের (দঃ) পবিত্র বাণী ওমর-বিন খাত্তাব কর্তৃক যখন উদ্ধৃত হয় (যা পূর্বে হাদিছ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি) পৃথিবীর স্থিরতা সম্বন্ধে তখন হযরত আলী (রাঃ), আব্বাস, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবাইর এবং সাদ-ইবনে-ওক্কাস (রাঃ) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সবাই এক বাক্যে রছুলের (দঃ) বাণী চিরসত্য বলে স্বীকার করলেন। কোন গোলক ধাঁধা তাঁদের হৃদয়ে আর দোলক দিতে পারল না।

চার : মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)

জগৎ জোড়া যে নামটি সবার মনে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে,—যার জ্ঞানতত্ত্বে স্বজাতি-বিজাতি আলোকিত হয়েছে সেই মহান সাধক হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)।

দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইহলৌকিক, পারলৌকিক প্রভৃতি বিষয়ের উপর এত গভীর আলোচনা যিনি করেছেন যার দান অতুলনীয়—তিনি তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ **'কিমিয়ায়ে সাআদত'** —৩য় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে **'পৃথিবী স্থির'**—প্রমাণ করেছেন নিম্নোক্ত হাদিছটির বর্ণনায় :

সাহাবী আনহা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত,

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

"যখন আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন তখন তাহাতে ভীষণভাবে কম্পন উপস্থিত হইল তাহা জীবজন্তু ও মানব-দানবের অবস্থানের যোগ্যই থাকিল না। সুতরাং আল্লাহ পাহাড়-পর্বতগুলিকে সৃজন করিয়া পৃথিবীর উপর বসাইয়া দিলেন। আর অমনি পৃথিবী থামিয়া গেল—শান্ত হইয়া স্বস্থানে স্থিতিশীল হইয়া গেল।"

পাঁচ : বিশ্ববিশ্রুত মনীষী জামাখসারী

জীবনভর জ্ঞান সাধক, আধ্যাত্মিক জগতের সুপণ্ডিত, অসংখ্য

গ্রন্থপ্রণেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ কোরআন বিশ্লেষণকারী, হাদিছ বিশারদ, চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বিশ্ব-বিখ্যাত **মুফাসসীর জামাখসারী**—তাঁর 'কাশ্‌-শাফ' গ্রন্থে পৃথিবীর স্থিরতা প্রমাণ করে নাস্তিক ও দোদুল্যমান চিন্তাবিদদের কবর রচনা করেছেন। 'পৃথিবী স্থির'—পরিচ্ছেদের টীকা—২ এর শেষাংশে তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

ছয়ঃ মওলানা জালালউদ্দিন রুমী

বিশ্ববিখ্যাত কবি, দার্শনিক, লেখক, জ্ঞানের মশাল বাহক; আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনকারী, পূর্বদেশীয় গেটে এ মহান জ্ঞান সাধক জালালউদ্দিনরুমী তাঁর অমর অবদান '**মসনবী শরীফ**'-এ উল্লেখ করেছেন আল্লাহর অপূর্ব শক্তি মহিমার বিকাশ করে এই বলেঃ

"তা বগশে থাকে হক চে খান্দাহাস্ত
কো মোরাকেব গাস্ত ও খামুশ মান্দাহাস্ত।"

অর্থাৎ "আল্লাহ পৃথিবীকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন যেন পৃথিবী নিশ্চুপ হইয়া দরবেশের ন্যায় তাঁহার ধ্যান করে।"

কিভাবে মহাশূন্যের মধ্যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এর উত্তর তিনি দিয়েছেন গভীর বৈজ্ঞানিক প্রমাণে পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞানীরা এ প্রমাণকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। পৃথিবী স্থির প্রমাণ করতে আমিও পদার্থবিজ্ঞানের Electromagnetic Theory-কে সম্বল করে দ্বিতীয় প্রমাণ উথাপন করেছি।

তাঁর সুন্দর যুক্তিটি 'পৃথিবী স্থির'—পরিচ্ছেদে (কোরআনের অংশ) টীকা—২ এ দেখিয়েছি। একজন কবি হয়ে কিভাবে বিজ্ঞানের এমন বাস্তব প্রমাণ দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের হতবাক করবেন তা চিন্তা করলে অবাক লাগে। তাঁর এ প্রমাণ দেখে মনে হয়—Electromagnetic Theory যেন তাঁরই হাতে রচিত। আধ্যাত্মিক, পারমাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারে যেন তাঁর বক্ষেই রক্ষিত। অবিশ্বাসীরা তাঁর এ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে খণ্ডন করতে পারবেন কি?

সাত : আশরাফ আলী থানভী (রাঃ)

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে যে নামটি বিশেষভাবে সবার মনে শ্রদ্ধা আনে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসাবে যার খ্যাতি সর্বত্র, সঠিক পথ নির্দেশক হিসাবে যার সাহস ছিল অদম্য, কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়ে যার মীমাংসা ছিল সঠিক—আল্লাহ রছুলের (দঃ) পথে সারা জীবন যার সাধনা ছিল নির্বিকার সেই স্বনামধন্য মহাত্মা মওলানা আশরাফ আলী থানভী। ভ্রম ব্যাখ্যাকারী কোরআন অনুবাদকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সূরা ইয়াছিনের ৪০ আয়াতে লিখেছেন—"উভয়েই (চন্দ্র-সূর্য) মহাশূন্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে।" "সমস্তই মহাশূন্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে"—লিখে যাঁরা পৃথিবীকেও ঘুরাচ্ছেন তাঁদের ভ্রম ব্যাখার কবর দিয়েছেন। সূরা রুম, সূরা ফাতের, সূরা লোকমান প্রভৃতি সূরায় যেখানে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন—"**পৃথিবী স্থির, অটল নড় চড় করে না**"—[যা অনুবাদে থানভী (রাঃ) সাহেব স্পষ্ট ভাষার বর্ণনা করেছেন]—সেখানে অবিশ্বাসী ও স্বার্থবাদীর দল "পৃথিবী আপন কক্ষে ঘুরিতেছে"—এ বাণী কোথাও কোরআনে খুজে না পেয়ে—'কুল্লুন-ফি-ফালাকে ইয়াছবাহুন' এই আয়াতকে সম্বল করে বিভ্রান্ত করার কৌশল খুঁজে পেয়েছেন। এ ভুলেরই চির অবসান করেছেন এ মহাত্মা আশরাফ আলী থানভী (রাঃ)।

বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও জ্ঞান তাপসের বাণীকে আল্লাহ পৃথিবীকে ও আকাশকে স্থির বলে ঘোষণা করেছেন তিনি তার সঠিক অনুবাদ করে বিশ্বমানবকে দেখিয়েছেন। তাঁর কোরআনের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ এর প্রমাণ।

আট : মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন

অখণ্ড বাংলা ও আসামের অদ্বিতীয় আলেম ও মোহাদ্দেস—কোরআন ও মেশকাত শরীফের অনুবাদক, ইসলাম মোহামেডান ল, হজের মাসায়েল, বীমার ফৎওয়া মেরাজ ও ছিনাচাক, হানাফী ফেকা

তত্ত্ব, বড় পীর সাহেবের জীবনী, আউলিয়াগণের জীবন, বঙ্গ-আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, ইসলাম-বিজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা, গবেষক, সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও আধ্যাত্মিক জগতের আলো এ মহান বঙ্গ-সন্তান যিনি তাঁর লেখনী ও জোরালো বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন—,"পৃথিবী স্থির সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে না।"—তাঁর রচিত কোরআনের অনুবাদ ও ইসলাম-বিজ্ঞান পুস্তক-এর প্রমাণ ।

নয় ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ)

মুফাসসির শিরোমণি, হযরতের (দঃ) চাচা, একান্ত সহচর যার দ্বারা হযরতের (দঃ) পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতিফলন ঘটেছে। জ্ঞানী-গুণী সাহাবা, কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও হযরতের (দঃ) ভক্তবৃন্দ যার বাণী শ্রবণ ও লিপিবন্ধ করার জন্য ভীড় জমাতো। নিখুঁত সত্য বলে দ্বিধাহীন চিত্তে সবাই যা গ্রহণ করত ও লিপিবন্ধ করত তিনিই বর্ণনা করেছেন রছুলের বাণী—যা হাদিছ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি এবং দেখিয়েছি যে পাহাড়গুলো কীলক স্বরূপ পৃথিবীর বক্ষে স্থাপন করার ফলে পৃথিবী দোলনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্থির হয়ে গেল এবং মানব ও জীবজন্তুর বসবাসে উপযোগী হলো। ঘূর্ণনশীল বস্তু বসবাসের উপযোগী নয় এটা কোরআন যেমন দেখিয়েছে বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তেমনি প্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যা হযরত আব্বাস (রাঃ) ব্যক্ত করেছেন।

বিজ্ঞানের প্রমাণ

যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের একই বিষয়বস্তু নিয়ে নানা প্রকার অনুসিদ্ধান্তেই পেঁছিতে দেখা যায়। তাই দেখা যায় অনেক সময় স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছিতে না পেরে মহাসত্যকেও মহাভ্রমে পরিণত করা হয়। আর তাকেই অনুসরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু ভুল প্রকাশ হবেই।

সত্য চাপা থাকবে না, থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। তবে অসত্য বেশীদিন বিরাজ করলে সত্যের স্থান দখল করে নেয় আর প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে। মনীষীদের মস্তিষ্কেও অসত্যের ঢেউ লেগে যায় আর সত্যের রেখাটাকে ঢেকে ফেলে তাকে প্রকাশ করার অবকাশ দেয় না। কত শতাব্দী চলে গেছে এই সত্যটার উপর যে, **"পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে।"** ইতালির বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও যে অসত্যটাকে মহাসত্যে পরিণত করে মানুষের চিন্তা-ধারায় তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন সেই অসত্যের বিরুদ্ধেই আমি নিজস্ব মতবাদে প্রমাণ করতে চাই যে, **"পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে।"**

প্রথম প্রমাণ

"Every particle in the universe attracts every other particle with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the squire of the distance."

[Newton]

$$F \propto \frac{M_1 M_2}{d^2}$$

$$\text{i.e. } F = G.\ \frac{M_1 M_2}{d^2}\ [\text{একটি ধ্রুবক}]$$

অর্থাৎ "বিশ্বের প্রতিটি পদার্থই একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভরের গুণফল এবং পরোক্ষ ভাবে দূরত্বের বর্গের উপর।"

[নিউটন]

$$\text{অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি} = G.\ \frac{\text{প্রথমটার ভর} \times \text{দ্বিতীয়টার ভর}}{(\text{দূরত্ব})^2}$$

উপরিউক্ত সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো জিনিসের আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে তাদের ভর ও দূরত্বের উপর। যদি একটা ভর অপরটার চাইতে বেশী হয় তবে যার ভর বেশী সে অন্যটাকে কাছে টানবে। দূরত্ব বেশী হলে এই আকর্ষণী শক্তি কমে যায় যার ফলে কাছে টানতে পারে না বটে, তবে তার শক্তিতে ছোটটাকে তার চতুর্দিকে ঘুরায়। এখন পৃথিবী ও সূর্যের কথা

চিন্তা করি। পৃথিবী একটা জড় পদার্থ। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সমবায়ে গঠিত। সুতরাং এর ওজন অত্যন্ত বেশী, পক্ষান্তরে সূর্য একটা অগ্নিপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। বায়বীয় পদার্থের সমবায়ে গঠিত। আমরা জানি আগুনের ওজন নেই। বায়বীয় পদার্থের ওজন এত কম যে, যত বেশী আয়তনই হোক না কোন এর ওজন গণনার মধ্যে আনা যায় না। তাই আমরা যখন বায়বীয় পদার্থের ওজন নেই তখন ধরে থাকি Negligible অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এছাড়া সূর্যের তাপমাত্রা (আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ৪ কোটি ডিগ্রী ও বহির্ভাগের উত্তাপ ১২,০০০ ডিগ্রী বৈজ্ঞানিকের মত অনুযায়ী) এত বেশী যে, কোন পদার্থই এতে কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। তাই সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চাইতে যত গুণই বেশী হোক না কেন তার ওজন পৃথিবীর ওজনের তুলনায় অনেক কম।[১] যদি সূর্যের ওজন পৃথিবীর চাইতে কম হয় তা হলে কম ওজনের পদার্থ বেশী ওজনের পদার্থকে ঘুরাতে পারে না। তাই সূর্য পৃথিবীকে ঘুরাতে পারে না। এটা অসম্ভব। বরং পৃথিবীই সূর্যকে তার চতুর্দিকে ঘুরায়।

দূরত্বের প্রশ্ন এখানে ধরা হচ্ছে না, কারণ একটি অপরটিকে নিশ্চয়ই ঘুরাচ্ছে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান সঠিক দূরত্বেই আছে যার ফলে একটি অপরটিকে টানতে পারছে না বটে তবে আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে একটি অপরটিকে তার চতুর্দিকে ঘুরাচ্ছে। যখন এই দূরত্বের ব্যবধান থাকবে না তখনই একটা অপরটাকে কাছে টানবে এবং মহাবিপদ ঘটাবে। তখন হবে

টীকা—১। পৃথিবীর ওজন $= ৬\text{'}০৬ \times ১০^{২১}$ টন (বৈজ্ঞানিকদের মতে)
সূর্যের ওজন $= ২ \times ১০^{২১}$ টন

[সর্বসাধারণের বুঝবার সুবিধের জন্য অনেক স্থলে ভর-এর পরিবর্তে ওজন শব্দ লিখলাম।]

মহাপ্রলয়। সূর্য যখন আপন কক্ষচ্যুত হবে তখনই দূরত্বের ব্যবধান কমে যাবে আর পৃথিবী তার আকর্ষণী শক্তির বলে সূর্যকে নিকটে টেনে আনবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

ধরা যাক, চুম্বক শক্তির প্রভাবে (Magnetic Theory) সূর্য অথবা পৃথিবী একটি অপরটিকে তার চতুর্দিকে ঘুরাচ্ছে। এই আকর্ষণী শক্তিও নির্ভর করে দুটো চুম্বকের ওজন ও দূরত্বের উপর। যেমন দুটো চুম্বক পাশাপাশি রাখলে একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। যদি একটি বড় হয় আর একটি ছোট হয় তবে বড় চুম্বকটা ছোট চুম্বকটাকে কাছে টানবে। কিন্তু যদি দূরত্ব অনেক বেশী হয় তাহলে এই আকর্ষণী শক্তি থাকলেও প্রভাব বুঝা যাবে না। এখন কথা হলো যে আকর্ষণী শক্তি থাকতে হলে দুটোকেই চুম্বক হতে হবে অথবা চুম্বকত্বের গুণ থাকতে হবে। নতুবা এ শক্তি হবে না। যেমন এক টুকরো চুম্বক এক টুকরো কাঠের পাশে রাখলে কোন আকর্ষণী শক্তি হবে না। এখন দেখি সূর্য ও পৃথিবী দুটোই চুম্বক কিনা অথবা চুম্বকত্বের গুণ আছে কিনা।

পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ড একটা চুম্বক। হাজার হাজার চুম্বকত্ব শক্তি বিশিষ্ট পদার্থ এতে বিদ্যমান। এক টুকরো লোহা কিছুদিন যাবত মাটিতে রাখলে দেখা যায় এতে চুম্বকত্ব শক্তি এসেছে। একটা দিক নির্ণয়ক যন্ত্রকে (কম্পাসকে) তার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকটা পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের সঙ্গে মিল হতে দেখা যায়। আরও অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে পৃথিবী একটা বড় চুম্বক। সূর্যের অবস্থা কি? সূর্য কি পৃথিবীর মত বড় একটা চুম্বক? সূর্য আগুনের তৈরী, একে বলা হয় প্রকাণ্ড একটা অগ্নিপিণ্ড। সবাই এক বাক্যে তাই স্বীকার করে। এতে গলিত ধাতব পদার্থ আছে কিনা সেটা আমরা আপাতত দেখছি না। দেখবার প্রয়োজনও বোধ করছি না কারণ পবিত্র কোরআনও বলেছে, **“এবং আমি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ সৃষ্টি**

করিয়াছি।"[১] মানুষের চিন্তাধারা আল্লাহর কথার সঙ্গে যখন মিলে গেছে তখন আর সন্দেহ নেই যে সূর্য একটা অগ্নিপিণ্ড ছাড়া আর কিছু।[২] যদি তাই হয় তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সূর্যের চুম্বকত্বের শক্তি মোটেই নেই কারণ **আগুনে চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়।** এটা বর্তমান বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণ। যদি সূর্যের চুম্বকত্ব শক্তি না থাকে তাহলে পৃথিবীর মত বিরাট চুম্বককে সে কিছুতেই ঘুরাতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতে পারে না, অসম্ভব।

তৃতীয় প্রমাণঃ আজীবনকাল থেকে শুনে আসছি এবং শৈশবকাল থেকেই দেখে আসছি যে নভোমণ্ডলের **'ধ্রুব নক্ষত্র'** এবং **হেডলির 'অকটেন্ট'** যেগুলো স্থির একই স্থানে অবস্থান করছে। যদি পৃথিবী ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই এ স্থির নক্ষত্রগুলো দৃষ্টি বহির্ভূত হতো। কিন্তু কই সে ত হচ্ছে না? শৈশবে শিক্ষক মহাশয় বোঝাতেন যে নৌকা অথবা স্টিমারের ভিতরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলে যেমন বোঝা যায় না যে তার নৌকা অথবা স্টিমার যাচ্ছে, সেইরূপ পৃথিবীতে থেকেও বোঝা যায় না যে পৃথিবী ঘুরছে। তখন মেনে নিয়েছি। এখন তো মানতে রাজী নই। কারণ নৌকা অথবা স্টিমার থেকে যখন তীরের স্থির কোন জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখা যায় তখন দেখা যায় সেগুলো সরে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি বহির্ভূত হচ্ছে। পৃথিবী যদি ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত স্থির নক্ষত্র দু'এক যুগ অথবা দু'এক শতাব্দীতে দৃষ্টি বহির্ভূত হতো। কিন্তু পূর্বপুরুষদের

টীকা—১। কোরআন সূরা নবা, আয়াত—১৩।

২। অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা সূর্যের মধ্যে লোহা, সীসা, ধাতব পদার্থ আছে কিন্তু তা ভুল। কেননা যার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ৪ কোটি ডিগ্রী তার মধ্যে কিছুই টিকতে পারে না। রসায়নবিজ্ঞান এর প্রমাণ দেয়।

বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে এগুলোর কোন পরিবর্তন হয়নি। দুটো জিনিসের পারস্পরিক ব্যবধান অথবা আপেক্ষিক দূরত্ব তখনই ঠিক থাকে যখন দুটোই একই গতিতে ঘুরতে থাকে অথবা দুটোই স্হির। **এখানে ধ্রুব নক্ষত্র স্থির আছে। তাই পৃথিবী স্থির না থাকলে একটা অপরটার দৃষ্টি বহির্ভূত হতো।** কিন্তু এ পরিবর্তন যখন বছরের কোন ঋতুতেই পরিলক্ষিত হয় না তখন দৃঢ় কণ্ঠেই বলা যায় যে পৃথিবী স্হির।

চতুর্থ প্রমাণ: বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল। ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন কক্ষের উপর ঘুরে আসে। তাহলে দেখা যায় এর গতিবেগ ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও বেশী। ধরলাম, পৃথিবী উক্ত গতিতে তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলসহ পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরছে। এত প্রচণ্ড গতিতে যে পৃথিবী ঘুরছে তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল তদ্রূপ অথবা কিছু কম গতিতে একই দিকে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু আমরা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে বায়ুমণ্ডলকে ঘুরতে দেখি। শুধু তাই নয়, পূর্ব হতে পশ্চিমদিকেও মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত দেখতে পাই। যে পার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের গতি ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলেরও বেশী তাকে অতিক্রম করে সামান্য মৃদুমন্দ বায়ু উল্টা-দিকে প্রবাহিত হবার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ দেখতে পাই না। **তাই পৃথিবী স্থির না হলে এরূপ বায়ু প্রবাহ অসম্ভব।**

পঞ্চম প্রমাণ: ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য কিন্তু শূন্যকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না। যদি তাই হয় তবে একটা এরোপ্লেন অথবা তদ্রূপ গতিনিয়ন্ত্রক কোন যান নিয়ে শূন্যে কিছুদূর যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক কম সেখানে তার গতি নিয়ন্ত্রণ (কণ্ট্রোল) করে কয়েক ঘণ্টা রাখবার পরে ঠিক সোজাসুজি নীচে নেমে আসলে দেখা যাবে যেখান হতে উঠেছে সেখানেই নেমে এসেছে। যেমন, মনে করি খুলনা হতে একটি এরোপ্লেন ১০/১৫ মাইল সোজা উপরে উঠে গেল। সেখানে এক ঘণ্টা গতি নিয়ন্ত্রণ

করে রাখলে এর মধ্যে পৃথিবী ১ হাজার মাইল পূর্বদিকে চলে যাবে। ১ ঘণ্টা পর এরোপ্লেনটা সোজাসুজি নামলে খুলনার উপর না পড়ে লাহোরের উপর পড়ত, কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হয় না। এর মাঝখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে সেই শূন্যের বায়ুমণ্ডলীতেও কিছু গতিবেগ থাকবে যার ফলে এরোপ্লেনটাকে ঠিক না রেখে পূর্বদিকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কতটুকু এবং কি গতিতে? হিমালয় পাহাড়ের উপর উঠলে দেখা যায় যে মানুষের ওজন অনেক কমে গেছে। কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম। এটা ত বাস্তব প্রমাণ। যদি তাই হয় তবে সেখানকার বায়ুমণ্ডলের চাপও কম এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গতিতে সে বায়ুমণ্ডল তাল মিলিয়ে চলছে না। হয় বেশী না হয় কম। মনে করি, সেখানে বায়ুমণ্ডল ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব-দিকে ঘুরছে। তাহলে এরোপ্লেনটাও স্থির না থেকে ঐ গতিতেই চলবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী যেখানে ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল চলছে, এরোপ্লেন সেখানে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল যাচ্ছে অর্থাৎ ৫০০ মাইল পিছনে থাকছে। লাহোর খুলনা হতে ১ হাজার মাইল দূরে হলে এরোপ্লেনটা স্পিড না দিয়ে ২ ঘণ্টা পর নীচে নেমে আসলেই লাহোরের উপর পড়তো (এরোপ্লেন নামবার সময়টুকু হিসাবে না এনে)। কিন্তু তাই কি হয়? তাই পরিষ্কার বোঝা যায় "যে **পৃথিবী ঘুরছে না।**"

ষষ্ঠ প্রমাণ: একই Capacity বিশিষ্ট দুইটি বন্দুক যদি একই স্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে গুলি নিক্ষেপ করে তাহলে দেখা যায় যে গুলিদ্বয় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সমান দূরত্ব নিয়েই মাটিতে পড়েছে। যদি পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরত তাহলে পশ্চিমে নিক্ষিপ্ত গুলিটি পূর্বদিকে নিক্ষিপ্ত গুলি অপেক্ষা বেশি জায়গা দখল করত। কিন্তু উভয় দিকের দূরত্বের যখন কোন ব্যবধান থাকে না তখন অতি সহজেই এ সিদ্ধান্তে পেঁছানো যায় যে পৃথিবী ঘোরে না। উপর দিকে গুলি ছুঁড়েও

দেখা গেছে যে যেখান থেকে গুলি ছোঁড়া হয় ঠিক সেখানেই এসে পড়ে। এতেও প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর গতি নেই।

সপ্তম প্রমাণ: পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। এই জলবেষ্টিত পৃথিবী আপন Axis-এর উপর ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল বেগে ঘুরলে স্থলভাগের কোন অস্তিত্বই থাকত না। চতুর্দিকে বেষ্টিত জলদ্বারা স্থলভাগ এমনভাবে প্লাবিত হতো যে জীবজন্তু, তরুলতা প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে তার জলরাশি ছিঁটকিয়ে মহাশূন্যে স্থান পেত। তখন আর মহাসমুদ্রের অস্তিত্বও থাকত না। এছাড়া পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে যদি ঘুরত তাহলে সামুদ্রিক স্রোতকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যেত না। পশ্চিম হতে পূর্ব দিকেই মাত্র এ স্রোত পরিলক্ষিত হবার কথা ছিল। কিন্তু এ দুর্ঘটনা যখন হয় না তখন নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে পৃথিবী স্থির।

অষ্টম প্রমাণ: সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীকে প্রায় ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে হয় এবং সম্পূর্ণ কক্ষপথ ঘুরে আসতে তার মোট ৩৬৫ দিন সময় লাগে। তাহলে দেখা যায় যে পৃথিবীর বার্ষিক গতি ঘণ্টায় ৬৮,৪৯৩$\frac{১}{২}$ মাইল। ধরলাম ৬৮,৫০০ মাইল। এদিকে চন্দ্রকে পৃথিবীর চতুর্দিকে যে কক্ষপথে ঘুরতে হয় সে কক্ষপথের দূরত্ব ১৮,০০,০০ মাইল—অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ২২৮৫ মাইল গতিতে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। অঙ্কে যাদের শুধুমাত্র সংখ্যার জ্ঞানটুকুও আছে তাদেরও এ ফাঁকটুকু ধরতে অসুবিধা হবে না যে কি করে চন্দ্র মাত্র ২২৮৫ মাইল গতিবেগ নিয়ে ৬৮,৫০০ মাইল গতিবেগ বিশিষ্ট পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। একটা রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চললে ১০ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন একটা মোটর নিয়ে রেলগাড়ির চতুর্দিকে ঘুরবার কল্পনা কি পাগলের কল্পনা নয়?

বিজ্ঞান ও কোরআন প্রমাণ দেয় যে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। এটাই যখন অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তখন এটাও

অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে যে পৃথিবী স্থির, নতুবা চন্দ্র এমন গতি নিয়ে অসাধারণ গতিসম্পন্ন পৃথিবীর চতুর্দিকে কিছুতেই ঘুরতে পারত না। পৃথিবী স্থির আছে বলেই চন্দ্রের ঘূর্ণন সম্ভব হচ্ছে।

1. Facts about the Earth (পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু তথ্য) :

Volume of the Earth $=1{\cdot}083\times10^{27}$; Density—5·5

$\therefore$ Mass = Volume × Density

$$=1{\cdot}083\times10^{27}\times5{\cdot}5=6{\cdot}05\times10^{27} \text{ tons}.$$

অর্থাৎ পৃথিবীর ভর = 6·5000000000 000000000000000 ton

= Surface Area = 197000000 miles (টন)

Diameter = 8000 miles

পৃথিবীর বয়স—৩৫০ কোটি বছর

অর্থাৎ, ৩৫×১০^{8} বছর

2. Facts about the Sun (সূর্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য) :

Volume of the sun = 1,330,000 times

Greater than that of the Earth

Density = 1·4

Mass = 2×10^{27} Ton

অর্থাৎ সূর্যের ভর

= 20000000000 0000000000 0000000 টন।

[টীকা 1 ও 2 Exploring our Universe

THE MOON

Earth Natural Satellite

BY

FRANKLIN M. BRANLEY

THOMASY CROWELL COMPANY

NEWYORK]

ভৌগোলিক প্রমাণ

গ্রহসমূহের অবস্থান : জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যকে কেন্দ্র করে নয়টি গ্রহ অবিরামভাবে তার চতুর্দিকে ঘুরছে। অবশ্য গ্যালিলিও-এর পূর্বে যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। **টলেমী**[১] **ও মুসলিম বৈজ্ঞানিক আলবেরুনীর** চেয়ে বেশী অবদান আকাশ বিজ্ঞানে আর কেউ রেখেছেন কিনা আমার জানা নেই। তাঁদের মতে পৃথিবীর চতুর্দিকেই এসব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। পৃথিবীকে স্থির ধরেই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর দূরত্বও নির্ণয় করা হয়েছে। পৃথিবীর যদি গতি থাকত তবে পৃথিবী হতে সেসব গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হত না। জ্যোতির্বিদ ও অংকশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ আজও এদের অবস্থান ও গতি নির্ণয় করার সময় পৃথিবীকে 'Static Position'-এ ধরে নেন। পৃথিবীকে Reference না করলে এবং এর গতি Zero না ধরলে সৌরমণ্ডলের ধারণা থাকত অজ্ঞাত। যে হিসেবের উপর নির্ভর করে গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান ও স্বরূপ দেখানো হয়েছে সেটাই পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম। এর পর আমরা বিচার করব যে পৃথিবী এদের মত গ্রহ কিনা, এর ঘূর্ণন আছে কিনা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুক্তিতেই বা এর ফল কি দাঁড়ায়।

টীকা—১ টলেমী : সম্রাট আলেকজাণ্ডারের একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। গ্রীক দেশে জন্ম হয়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তিনি রাজত্ব করেন। তিনি ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর মতবাদ শুধু ইউরোপে নয় সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছিল। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন **'পৃথিবী স্থির'**। তাঁর মতবাদ দেড় হাজার বছর ধরে প্রচলিত ছিল।

গ্রহের তুলনায় পৃথিবী ছোট না বড় ?

(১)

॥ পৃথিবী হতে ছোট গ্রহ ॥

বুধ—পৃথিবীর ২১ ভাগের এক ভাগ।
শুক্র—পৃথিবী হতে কিছু ছোট।
মঙ্গল—পৃথিবীর ৪ ভাগের ১ ভাগ।
চন্দ্র (পৃথিবীর একটি উপগ্রহ) —পৃথিবী হতে ৪৯ গুণ ছোট।

॥ পৃথিবী হতে বড় গ্রহ ॥

বৃহস্পতি—পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ শত গুণ বড়।
শনি — ,, ,, ৭৮২ গুণ বড়।
ইউরেনাস— ,, ,, ৬৫ গুণ বড়।
নেপচুন — ,, ,, ২৫ গুণ বড়।
সূর্য (সৌরজগতের একটি জ্যোতিষ্ক)—পৃথিবী অপেক্ষা
১৩ লক্ষ গুণ বড়।

উপরের চার্ট হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতকগুলো গ্রহ যেমন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র পৃথিবী হতে ছোট (চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ অথচ গ্রহগুলোর সঙ্গে লিখলাম কেন সে জবাব নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন চন্দ্রের উৎপত্তি পরিচ্ছেদে)। এখন আমরা জানতে চাই, যে গ্রহগুলো ছোট এবং **পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এরা কেন পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে না ?** যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে পারে আর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের বেলায় এসে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, এটা কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ? পৃথিবীর নিকটবর্তী হবার জন্য এবং ওজন কম হবার জন্য যদি চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে তবে একই কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন্ আইন ধরে এরা সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে ? এটা কি শুধু কল্পনা নয় ? এর কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও যুক্তি আছে ?

চন্দ্রের পরেই মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। পৃথিবী হতে মাত্র ৪৮,০০,০০০ মাইল দূরে। অথচ এই মঙ্গল গ্রহ সূর্য হতে ৮,৮২,০০০,০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আকৃতির দিক থেকেও আমরা দেখতে পাই এটা পৃথিবীর ৪ ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবী মঙ্গল গ্রহের চেয়ে চার গুণ বড়। নিঃসন্দেহেই তাহলে বলতে পারি যে এর ওজন পৃথিবীর চেয়ে কম। অথচ সেই মঙ্গল গ্রহই পৃথিবীর টানে আকৃষ্ট না হয়ে তার চতুর্দিকে ঘুরছে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি তবে মহাকর্ষণ সূত্র মানতে চান না? না, এটাই বলতে চান যে বড়টাই সেই ছোটটার চতুর্দিকে ঘুরবে? যদি তাই বলেন, তবে এটা বলছেন না কেন যে, বিরাট আকারের সূর্যও পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরবে? ঠিক আছে এবার বড় আকারের গ্রহগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করছি। আপনাদের মতে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা তের শত গুণ বড়। শনি ৭৮২ গুণ বড়। এগুলোর চতুর্দিকে কিন্তু পৃথিবীকে ঘুরান হয়নি। এর জবাবে আপনারা নিশ্চয় বলবেন যে এসব গ্রহের দূরত্ব পৃথিবী হতে অনেক বেশী। তাই পৃথিবীর নিকটতম বৃহৎ গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকেই ঘুরছে।

বেশ কথা! বৃহস্পতি গ্রহটি আকৃতির দিক থেকে শনির চেয়ে অনেক বড়, প্রায় দ্বিগুণ। ইউরেনাস ও নেপচুনও বৃহস্পতির চেয়ে বহুগুণে ছোট। সূর্য থেকে এরা কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। **এসব ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহের নিকটে বৃহস্পতি গ্রহ থাকা সত্বেও কেন এরা বহু দূরের সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে মহাকর্ষণ শক্তির বরখেলাপ করছে? বৃহস্পতির চতুর্দিকে কি এদের ঘুরবার কথা নয়?** আছেন কি কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বা চিন্তাশীল মনীষী বা বৈজ্ঞানিক যিনি এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

আমরা সাধারণ অংকশাস্ত্রবিদগণ দেখতে পাই যে বৃহস্পতি হতে শনি গ্রহের দূরত্ব ৪০ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। অথচ সূর্য হতে শনির দূরত্ব ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। তাই মহাকর্ষণ সূত্র

অনুযায়ী ঘুরতে হলে বৃহস্পতির চতুর্দিকে শনি গ্রহের না ঘুরে উপায় আছে ? কিন্তু তা ঘুরছে না। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে নয়, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। যেহেতু পৃথিবী এ বিশ্বের কেন্দ্র, এর ওজন যে কোন গ্রহ নক্ষত্রের ওজনের চেয়েই বেশী। পৃথিবীর চতুর্দিকে তারা যে অবস্থায় ঘুরছে তার একটি চার্ট দেওয়া গেল ঃ

পৃথিবী হতে নক্ষত্রের দূরত্ব (২)

নক্ষত্রের নাম	পৃথিবী হতে এর দূরত্ব
ধ্রুব (উঃ আঃ)	৪৭ আঃ বঃ
ডেনিচ (৭০° অক্ষরেখা)	৪৬৫ আঃ বঃ
(মার্চ মাসের শেষের দিকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়)	
রিগেল (১০° দঃ অঃ)	৫৪৫ আঃ বঃ
বেটেল জিয়াস (১০° উঃ অঃ)	৩০০ আঃ বঃ
আচারনার (৭০° দঃ অঃ)	৭০ আঃ বঃ
কেনোপাস	৬৫০ আঃ বঃ

পৃথিবী হতে গ্রহের দূরত্ব (৩)

গ্রহের নাম	**দূরত্ব**
মঙ্গল	৪৮,০০,০০০ মাইল
শুক্র	২,৬০,০০,০০০ ,,
বুধ	৬,৭০,০০,০০০ ,,
বৃহস্পতি	৩৮,৭০,০০,০০০ ,,
শনি	৭৮,৮০,০০,০০০ ,,
ইউরেনাস	১,৬৭,৮০,০০,০০০ ,,
সূর্য (জোতিষ্ক)	৯,৩০,০০,০০০ ,,
নেপচুন	২৬৮,২০,০০,০০০ ,,
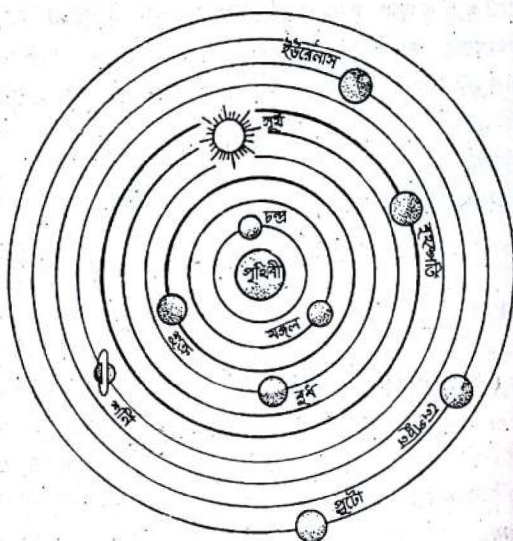
চিত্র নং ঃ ১

পৃথিবী হতে পর্যায়ক্রমে নিকটতম গ্রহ (৪)

নাম	দূরত্ব
চন্দ্র	২,৪০,০০০ মাইল
মঙ্গল	৪৮,০০,০০০ ”
শুক্র	২,৬০,০০,০০০ ”
বুধ	৬,৭০,০০,০০০ ”
সূর্য (জোতিষ্ক)	৯,৩০,০০,০০০ ”
বৃহস্পতি	৩৮,৭০,০০,০০০ ”
শনি	৭৮,৮০,০০,০০০ ”
ইউরেনাস	১,৬৭,৮০,০০,০০০ ”
নেপচুন	২৬,৮২০,০০,০০০ ”
প্লুটো	৩৫৮ কোটি প্রায়

পৃথিবী হতে গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব নির্ণয় করে জ্যোতির্বিদগণ আমাদের সুন্দর একটি ধারণা দিয়েছেন। আমরা উক্ত ধারণাকে অনেকটা নির্ভুল বলেই স্বীকার করি। এখন প্রশ্ন হলো, **যে পৃথিবী যদি স্থির না থাকে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিরাট অঙ্কের স্থান পরিবর্তন করে তাহলে এসব দূরত্ব কি করে নির্ভুল বলা যায়?** পৃথিবী, সূর্য ও যে কোন নক্ষত্রকে সম্মুখে রেখে আমরা বিচার করি।
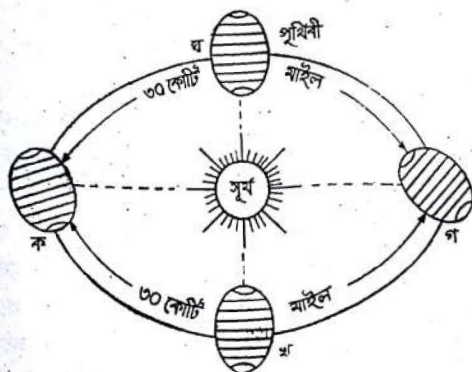
চিত্র নং ঃ ২

মনে করি পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল কক্ষের উপর পরিভ্রমণ করে ঘ অবস্থায় আছে। যেখান হতে ধ্রুব নক্ষত্র ঙ ৪ আঃ বর্ষ দূরে। পৃথিবী ঘ অবস্থায় স্থির নেই। লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে ক অবস্থায় এসে পৌঁছল। অর্থাৎ ১৫ কোটি

মাইল দূরে সরে আসল। এই ক অবস্থা হতে ধ্রুব নক্ষত্রের দূরত্ব হবে—৪৭ আঃ বর্ষ + ১৫ কোটি মাইল। গ অবস্থা হতে এতটুকু দূরত্বই হবে।

যখন খ পৃথিবী এসে পড়ে তখন ধ্রুব নক্ষত্রের দূরত্ব কত? এখান থেকেও কি ৪৭ আঃ বর্ষ দূরে হবে? গণিতে যাঁদের কিছুটা জ্ঞান আছে তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন যে এ অবস্থা হতে ধ্রুব নক্ষত্রের দূরত্ব হবে—৪৭ আঃ বঃ + ১৮ কোটি মাইল।

আর একটি মজার ব্যাপার এই যে ক, খ, গ, ঘ যে কোন অবস্থা থেকেই আমরা এসব নক্ষত্রগুলির সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি না। কেননা পৃথিবী এসব জায়গায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না। এর গতিবেগ প্রতি মিনিটে তাঁদের মতে ১ হাজার মাইলেরও বেশী। পৃথিবী স্থির না থাকলে বলতে হয় যে, ধ্রুব নক্ষত্রের দূরত্ব যা আমাদের দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণই ভুল। আর যদি নির্ভুল বলি তবে বলতে হবে যে **পৃথিবী স্থির, এর বার্ষিক গতি নেই**।

স্থির নক্ষত্র ধ্রুবের সঙ্গেই এতটুকু গোলমাল। এসব গ্রহ-নক্ষত্র স্থির নেই—তাদের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক কেমন থাকে? মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, ডেনচি, আচারনার ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রগুলো তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। একবার পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে একবার বহুদূরে চলে যাচ্ছে। এছাড়া পৃথিবী নিজেও যদি ঘোরে তবে তাদের দূরত্বের ব্যবধান প্রতি সেকেন্ডেই পরিবর্তিত হবে। এ অবস্থায় পৃথিবী হতে তাদের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করবার কি কোন পন্থা আছে। এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে কি না জানি না, যা দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এরূপ সঠিক-ভাবে ঘূর্ণনশীল বস্তুসমূহের দূরত্ব ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর কক্ষ হতে নিতে পেরেছেন?

পৃথিবী স্থির না ধরলে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্বের হিসাব ভুল। একেবারেই ভুল। পরপৃষ্ঠার চিত্র এ কথার প্রমাণ দেয়—
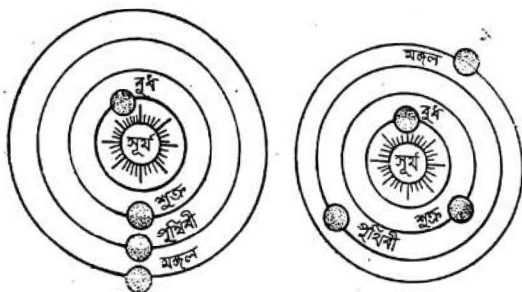
পৃথিবী হতে মঙ্গলের দূরত্ব
৪৮,০০,০০০ মাইল
[Fig : II]

পৃথিবী হতে মঙ্গলের দূরত্ব
৯,৩০,০০,০০০ মাইল + ১৪,১০,০০০০০
= ২৩,৪০,০০০,০০ মাইল [Fig : I]

সূর্য হতে গ্রহের দূরত্ব (৫)

গ্রহের নাম	দূরত্ব
বুধ (MERCURY)	৩,৬০০,০,০০০ মাইল
শুক্র (VENUS)	৬,০০,০০,০০০ „
পৃথিবী (EARTH)	৯,৩০,০০,০০০ „
মঙ্গল (MARS)	১৪,১০,০০,০০০ „
বৃহস্পতি (JUPITER)	৪৮,০০,০০,০০০ „
শনি (SATURN)	৮৮,১০,০০,০০০ „
ইউরেনাস (URANUS)	১,৭৭,১০,০০,০০০ „
নেপচুন (NEPTUNE)	২,৭৭,৫০,০০,০০০ „
প্লুটো (PLUTO)	৩৬,৭০,০০,০০০ „

গ্রহের গতি (বার্ষিক) (৬) [প্রচলিত মতবাদ]

বুধ	৮৮ দিনে	সূর্যের	চতুর্দিকে	ঘুরে	আসে।	
শুক্র	২২৫	”	”	”	”	”
পৃথিবী	৩৬৫	”	”	”	”	”
মঙ্গল	৬৮৭	”	”	”	”	”
বৃহস্পতি	১২ বছরে		”	”	”	”
শনি	৩০	”	”	”	”	”
ইউরেনাস	৮৪	”	”	”	”	”
নেপচুন	১৬৫	”	”	”	”	”
প্লুটো	২৪৮	”	”	”	”	”
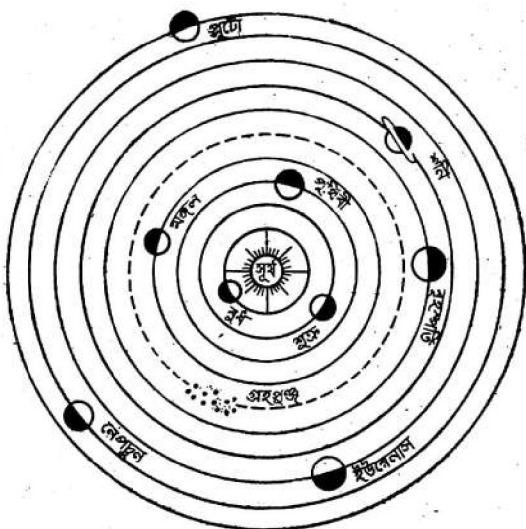
[জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য ও গ্রহের অবস্থান]

গ্রহের গতি (আহ্নিক) (৭) [প্রচলিত মতবাদ]

গ্রহের নাম	সময়
পৃথিবী	২৪ ঘণ্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে
মঙ্গল	২৪½ " " " " "
বৃহস্পতি	১০ " " " " "
শনি	১০-২৪ মিঃ " " " "
ইউরেনাস	৯½ " " " " "
নেপচুন	— এখনও বুঝতে বাকী
প্লুটো	ঐ
বুধ	যন্ত্রে ধরা পড়ে না (আহ্নিক গতি নেই)
শুক্র	
চন্দ্র	

এবারে আমরা বার্ষিক ও আহ্নিক গতির উপর কিছুটা আলোচনা করব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বার্ষিক গতির পিছনে তিনটি শর্ত থাকতে হবে। যেমন, (১) পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দু সর্বদা থাকতে হবে ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষপথের সাথে থাকবে একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রী (৬৬½°) কোণে। (৩) পৃথিবীর কক্ষপথ হবে একটি নির্দিষ্ট দিকে দৈনিক দশ লক্ষ মাইল বেগ বিশিষ্ট সূর্যের চতুর্দিকে।

পৃথিবীর মেরুরেখা পৃথিবীর ঘূর্ণনের যে কোন অবস্থাতেই ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হলে কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬½° কোণ সৃষ্টি করে না। কক্ষের উপর দু-একটি জায়গা ছাড়া ধ্রুব নক্ষত্রকে উত্তর আকাশে একই অবস্থায় দেখবার কল্পনা যুক্তি ও প্রমাণবিরুদ্ধ।
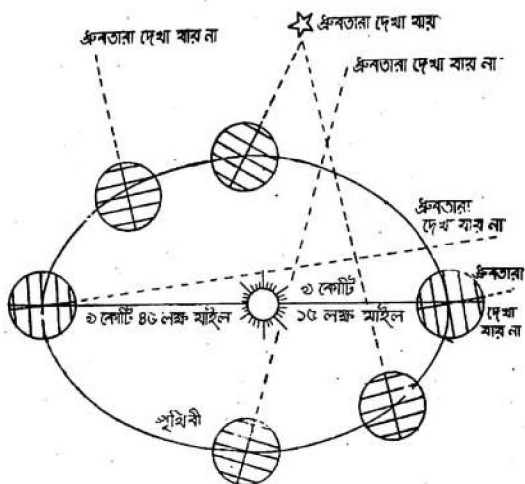
কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা ৬৬½° কোণ সৃষ্টি করলে ধ্রুব তারার অবস্থা

ভৌগোলিক প্রমাণে ঋতু পরিবর্তন বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

"পৃথিবীর কক্ষতলে উহার অবস্থান যেখানেই হউক না কেন এই কোণের পরিমাণ সর্বত্র সমান বলিয়া ইহার কক্ষ সকল অবস্থায় পূর্ববর্তী যে কোন স্থানের অবস্থানের অক্ষের সহিত সামন্তরাল থাকে।"

জ্যামিতির প্রমাণে আমরা দেখছি যে, কোন অবস্থায়ই সমান্তরাল রেখা মিলিত হতে পারে না। পৃথিবী ঘূর্ণনের সময় তার কক্ষের উপর কোটি কোটি মাইলের ব্যবধানে অবস্থান করে। কোটি কোটি মাইল দূরের সমান্তরাল রেখা কোন সময় এবং কোন অবস্থাতেই মিলিত হয়ে ধ্রুবকে ছেদ করতে পারে না। তাই সূর্যের চতুর্দিকের ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথের উপর পৃথিবী ঘুরে

ধ্রুব নক্ষত্রকে উত্তর আকাশে একই অবস্থায় রাখা প্রমাণবিরুদ্ধ। কোন অংকশাস্ত্রবিদ ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি এ কল্পনাপ্রসূত প্রমাণকে মানতে পারেন না। পৃথিবী স্থির আছে বলেই যে কোন স্থান থেকেই ধ্রুবকে উত্তর আকাশে দেখা যায়। এর উত্তর মেরু ধ্রুবকে সম্মুখে রেখে আজীবন কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে।
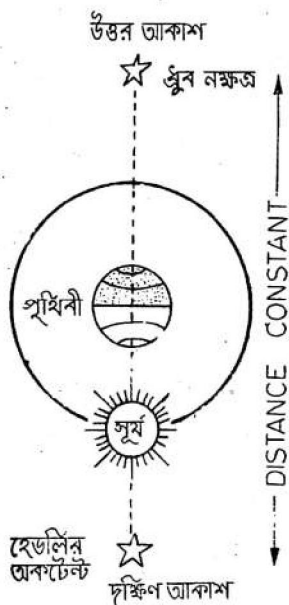
চিত্র নং ঃ ১

ঋতু পরিবর্তন

পৃথিবীর সর্বত্র সূর্য কিরণ সমানভাবে পড়ে না। কোথাও বা লম্বভাবে, কোথাও বা হেলান অবস্থায় বিভিন্ন কোণ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পতিত হয়। যেখানে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে সেখানে পৃথিবী অতি মাত্রায় তাপ সংগ্রহ করে।

আর যেখানে হেলান অবস্থায় পড়ে বা একদম পড়ে না সেখানে স্বভাবতই শীতল হয়। পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতে গরম ও গরম হতে ঠাণ্ডা অবস্থায় রূপান্তরকেই ঋতু পরিবর্তন বলে। ৩৬৫ দিনে এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সমস্ত বছরকে ৬টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর এক-একটি ভাগকে ঋতু বলে।
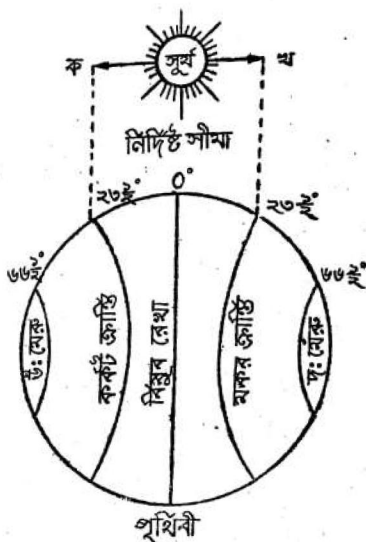
চিত্র নং ঃ ২

[নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে (ক হতে খ) সূর্য তার আপন কক্ষের উপর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, দিবা রাত্রি এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।]

সূর্য ঘূর্ণনের ফলে কিভাবে ঋতু পরিবর্তন ঘটে তা চিত্র নং ২ এবং চিত্র নং ৩-এর সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে। সূর্যকিরণ যখন লম্বভাবে পৃথিবীর উপর পতিত হয় তখন তা স্বল্প পরিমাণ

জায়গার উপর বিস্তৃতি লাভ করে এবং যেহেতু সূর্যরশ্মি অল্প বায়ুস্তর ভেদ করে তাই এর প্রখরতা অত্যন্ত বেশী হয়। কিন্তু যখন তা হেলানো অবস্থায় পড়ে তখন অধিক সংখ্যক জায়গার উপর ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া বেশী বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে এর প্রখরতা কমে যায়। সূর্যরশ্মির এ পতন অবস্থার উপরই নির্ভর করে পৃথিবীর যে কোন্ স্থানের উত্তাপ : আর এ উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিই ঘটায় ঋতু পরিবর্তন।

সূর্যকিরণের পরিমাণ বেশী হলে অর্থাৎ দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে ঐ সময় পৃথিবী পৃষ্ঠ যে তাপ সংগ্রহ করে রাত্রে, তা বিকিরণ করে ও অনেকটা সঞ্চিত থাকে। দিনের পর দিন এভাবে তাপ সঞ্চয়ের ফলেই আসে গ্রীষ্মকাল (Summer)। আবার রাত্রি বড় হলে দিবাভাগে যে তাপ সংগৃহীত হয় তা বিকিরণ করেও পৃথিবী পৃষ্ঠ নিজস্ব সঞ্চিত তাপ কিছু কিছু দৈনিক বিকিরণ করে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবী তার নিজস্ব তাপ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে ফল দাঁড়ায় ঐ স্থানের শীতকাল (Winter)। দিবা রাত্রি সমান হলে তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ প্রায় সমান থাকে। ফলে ঋতু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বিষুব অঞ্চলে বছরের সকল সময়ই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান। তাই ঐ অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন নেই বললেই চলে।

শীত ও গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি আমাদের দেশে দুবার এরূপ তাপের সমতা রক্ষা করা হয়। এ সময়কেই বসন্ত ও শরৎকাল বলা হয় (Spring and Autumn)।

সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থা

২১শে মার্চ সূর্য বিষুবরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এর আলোক উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সমভাবে পতিত হয়। এই তারিখে দিন ও রাত্রি সমান। এরপর সূর্য ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যেতে থাকে। যখন শেষ সীমায় পেঁছায় তখন উত্তর গোলার্ধে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় এবং প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের সর্বত্রই দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রি ছোট হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন এর বিপরীত অবস্থা।
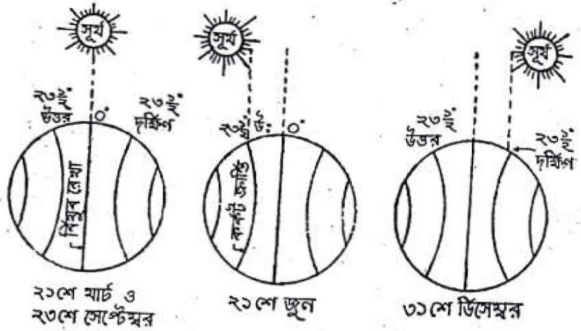
চিত্র নং ঃ ৩

অর্থাৎ রাত্রি বড় দিন ছোট। উত্তর মেরু হতে ২৩½° পরিমিত স্থান অর্থাৎ ৬৬½° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানে তখন সর্বত্র দিন। কেননা সূর্যকিরণ মেরুবিন্দু পার হয়েও পড়তে থাকে। রাত্রিতেও সূর্যকিরণ থাকে। বিষুবরেখা হতে উত্তর গোলার্ধের শেষ সীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ সূর্যের ভ্রমণের শেষ সীমা পর্যন্ত) পেঁছাতে মোট ৯১ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। ২১শে জুনের পর অর্থাৎ ২২শে জুন হতে সূর্য আবার দক্ষিণ দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে এবং বিষুবরেখা পর্যন্ত পেঁছাতে পুনরায় মোট ৯১ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। বিষুবরেখা হতে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত এবং কর্কটক্রান্তি হতে পুনরায় বিষুবরেখা পর্যন্ত ফিরে আসতে

১৮২ দিন ১২ ঘণ্টা (৬ মাস) সময় লাগে। এখান থেকে সূর্য পুনরায় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যখন ২৩½° দঃ অক্ষাংশে পৌঁছায় তখন সূর্যকিরণ সেখানে লম্বভাবে পতিত হয়। উত্তর মেরু তখন সূর্যের আলোক হতে বঞ্চিত হয়। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য তার পরিভ্রমণের শেষ সীমায় পৌঁছায়। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত্রি ছোট। ঐ সময় সূর্যকিরণ দক্ষিণ গোলার্ধের ৬৬½° পর্যন্ত পৌঁছায়। ২২শে ডিসেম্বর হতে সূর্য আবার উত্তর দিকে সরতে থাকে। বিষুবরেখা হতে মকরক্রান্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে পুনরায় বিষুবরেখা পর্যন্ত ফিরে আসতে সূর্যের ১৮২ দিন ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে দেখা যায় মোট ৩৬৫ দিনে সূর্য তার নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবার ফিরে আসে।

আমাদের কথার সঙ্গে প্রমাণের মিল নেই। আমরা কথায় বলি The Sun rises in the East and sets in the West—শুধু তাই নয়, এটাকে Universal Truth বা চিরসত্য বলে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আমরাও তাই মেনে নিই। কোথাও কোন পুস্তকে লেখা নেই বা কোন দেশের কোন শিক্ষক আজ পর্যন্ত এ কথা শিক্ষা দেন না যে—"The Earth rises in the East and sets in the West"—সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ সত্যের অপলাপ করে যদি কোন ছাত্র ক্লাসে অথবা পরীক্ষায় বলে বা লেখে যে পৃথিবী পূর্ব দিকে উদিত ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তবে সে ছেলে নিতান্ত পাগল বলে আখ্যায়িত হবে অথবা অকৃতকার্যতার একটি সিল তার পিঠে নিতে বাধ্য হবে।

অন্তর প্রকৃতির নিয়ম থেকেই সত্য বলতে চায় কিন্তু স্বার্থ ও সংঘাতের ফলে অথবা লোভ বা মোহের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় জিহ্বায় মিথ্যা এসে যায়। তবুও মিথ্যাকে ঢাকা যায় না। হাজার মিথ্যা দিয়ে একটা সত্যকে তৈরী করা যায় না। একটা সত্যকেও হাজার মিথ্যা দিয়ে তেমনি ঢাকা যায় না। সত্য আপন স্বভাবেই বের হয়ে আসে। এর প্রমাণ পরপৃষ্ঠার উদ্ধৃতি।

REVOLUTION OF THE EARTH

1. APPEARENT MOVEMENTS OF THE SUN :

"In addition to the daily rising and setting of the Sun, there is a slower change in its position which can be detected by noting the point of Sunrise or Sunset for a week or two. In the North temperate zone, the Sun rises exactly in the East and sets due West on March 21 and September 23. From March to September Sunrise and Sunset are North of true East and West and the days are longer than the night. But from September to March the Sun rises and sets south of the East and the nights are then longer than the days. The midday Sun also changes in position. It is higher in summer than in winter, but is always in the Southern half of the heavens. in the Southern hemisphere, the same changes occur in the opposite season ; but there the midday Sun is always in the Northern half of the heavens."

কৌতূহলী পাঠকদের নিশ্চয়ই কথাগুলো কে লিখেছেন জানতে আগ্রহ আসবে। তাই লেখকের পরিচয় দিয়ে নিই। লেখক বাঙালি নয়। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ R. S. Tarr। তিনি তাঁর 'New Physical Geography'-তে লিখেছেন (পৃষ্ঠা নং—৩৯৭। পরিচ্ছেদ—Appendixes)—

পৃথিবী ঘুরছে এটা তাঁর প্রমাণেরই উদ্দেশ্য ছিল এ পরিচ্ছেদে। তাই heading দিয়েছেন : "Revolution of the Earth."

তিনি প্রমাণও করেছেন যে পৃথিবী ঘুরছে তাই ঋতু পরিবর্তন

হচ্ছে। এ প্রমাণ অবিশ্বাস করা সহজ কথা নয়। কেননা যখন যেভাবে ঘুরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ঠিক সেই ভাবেই যেন হাত দিয়ে ঘুরিয়েছেন। অনেক সময় সতর্ক করেও দিয়েছেন এবং বলেছেন—

"Let a globe or ball represent the Earth and a lamp or candle the Sun. Carry the globe in a circular path around the light ; being careful to always keep the axis inclined at same angle."
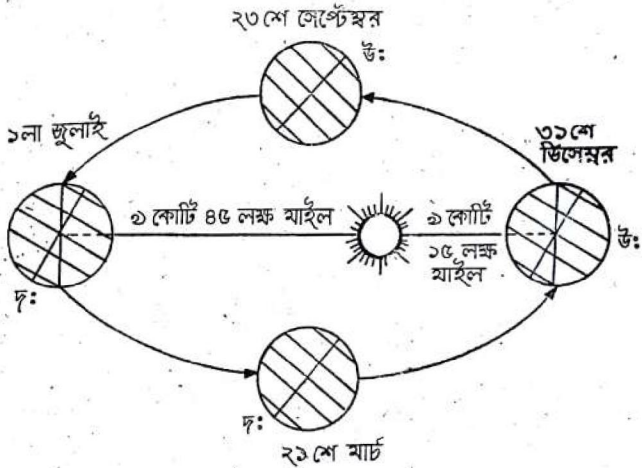
চিত্র নং ঃ ৪

তিনি বলেছেন, একটি মোমবাতির চতুর্দিকে একটি গ্লোব অথবা বল এমন ভাবে ঘুরাতে হবে যেন circular path-এ গ্লোবটির Axis সব সময় হেলানো অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট কোণ সৃষ্টি করে।

সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীকে যে পথে ঘুরানো কল্পনা করা হয় তা তাঁদেরই মতে circular নয়, eliptical ; তাঁরা একথা বলে প্রমাণ করেছেন যে সূর্য হতে পৃথিবীর এক পাশের দূরত্ব ৯ কোটি

৪৫ লক্ষ মাইল এবং অন্য পাশের দূরত্ব ৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। বার্ষিক গতির জন্য ৮৭ নং পৃষ্ঠার ৪ নং চিত্র দিয়ে ভৌগোলিক পণ্ডিতগণ আমাদের বুঝিয়ে থাকেন (চিত্র নং ৪)।

তাহলে দেখা যায় যে তাঁদের প্রমাণের সঙ্গে কথার কোন মিল নেই। যখন যেভাবে ইচ্ছা বলে থাকেন ও প্রমাণে তা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। এবারে প্রমাণের কথায় আসি। মোমবাতিকে কেন্দ্র করে এবারে চক্রাকৃতি পথে—**circular path** গ্লোব-এর **Axis** নির্দিষ্ট কোণ সৃষ্টি করে কিনা আমরা দেখছি (চিত্র নং ৫)।
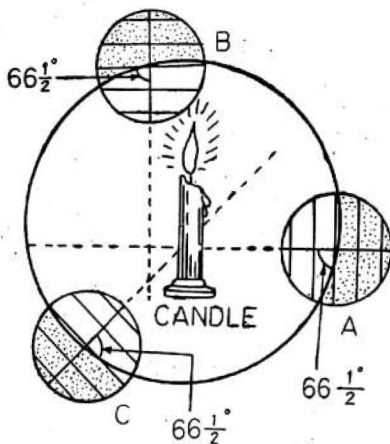
চিত্র নং ঃ ৫

Circular path-এ যদি গ্লোব ঘুরানো যায় এই **path**-এর সঙ্গে বলের **Axis** নির্দিষ্ট কোণ ৬৬½°-তে সবসময় থাকে তাহলে দেখা যাবে যে এদের **Axis** বাড়িয়ে দিলে একই **point**-এ অর্থাৎ **candle head**-এ ছেদ করে না। যদি এদের **Axis candle**-এ ছেদ করানো যায় তাহলে নির্দিষ্ট কোণ ৬৬½° বা ২৩½° সৃষ্টি করে না। আর তা না করলে মোমবাতিটির আলোকরশ্মি বলের উপরে সমভাবে পড়ে না। এছাড়া আর একটি মজার ব্যাপার এখানে যে, যদি বলটিকে

মোমবাতির চতুর্দিকে ঘুরানো যায় তবে বলটির একটির এক পাশেই শুধু আলোক পড়ে। সমস্ত পথের উপর নির্দিষ্ট কোণ অনুযায়ী ঘুরে এসেও বলের অপর পাশে আলোক পড়ে না। এর উপর আবার যদি উত্তর দিকে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু 'ধ্রুবের' মত নক্ষত্রকে সম্মুখে এক বরাবর রাখার নিয়ত করা হয়, তাহলে ত ল্যাবরেটরীর মধ্যেই এ প্রমাণের কবর রচনা করা যায়।

যা হোক, আমার বক্তব্য ছিল এখানে যে Revolution of the Earth—Chapter-এর heading দিয়ে Apparent movement of the Sun দেখিয়ে ঋতু পরিবর্তন বোঝান হয়েছে। সূর্যকে স্থানচ্যুত না করে ঋতু পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ সত্যকে ঢাকতে পারেন নি বলেই সূর্যের গতিপথের শেষ সীমাদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বরে সূর্য উদিত হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার কথা উল্লেখ করে পরিষ্কার বলেছেন—

"In the North temperate zone the Sun rises exactly in the East and sets due the West on March 21 & September 23. আরও বলেছেন—But from September to March the Sun rises and sets South of due East and West."

সূর্যের উদয় ও অস্তের অবস্থার উপরই পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতা নির্ভর করে, পৃথিবী ঘূর্ণনের উপর নয়—এ সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সূর্য পৃথিবীর উপর কিভাবে কিরণ দেয়, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ছাড়াও যে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি, ঋতু পরিবর্তন সম্ভব, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ক্রমাগত ছয় মাস দিন ও রাত হতে পারে সূর্য ঘূর্ণনের ফলেই তার একটি ধারণা দিচ্ছি। জ্ঞানী, গুণী ও কৌতূহলী ছাত্র, শিক্ষক ভাইয়েরা প্রমাণ করে এর সত্যতা উপলব্ধি করুন।

২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বত্রই দিবা-রাত্রি সমান থাকে। দিন ও রাত্রের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টা।

২১শে মার্চকে ইংরেজিতে **Vernal Equinox (spring)** ও ২৩শে সেপ্টেম্বরকে **Autumnal Equinox (Autumn)** বলা হয়। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণের শেষ সীমা পর্যন্ত পেঁছায় বলে ঐ দিনকে **Winter solstice** এবং ২১শে জুন সূর্য উত্তরের শেষ সীমা পর্যন্ত পেঁছায় বলে ঐ দিনকে **Summer solstice** বলা হয়।

বার্ষিক গতির উপর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যে তিনটি শর্ত ছিল তার দুটো আমরা আলোচনা করলাম। এবারে আমরা তৃতীয় শর্তটি নিয়ে আলোচনা করব। এ শর্তটি আলোচনা করতে হলে গণিতের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।
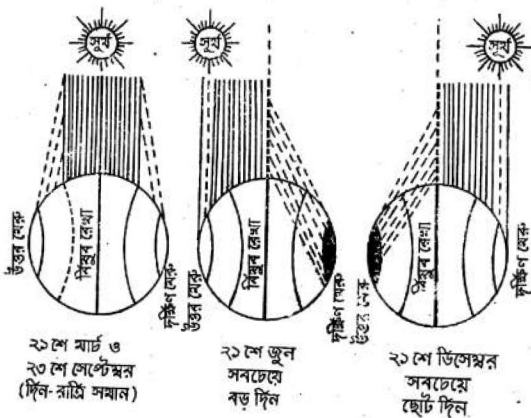
চিত্র নং ঃ ১৬

বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর উপর সূর্যের কিরণ

কেননা এ শর্তে বলা হয়েছে ঃ

"পৃথিবীর কক্ষপথ হবে একটি নির্দিষ্ট দিকে দৈনিক দশ লক্ষ মাইল বেগ বিশিষ্ট সূর্যের চতুর্দিকে।"

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম এর মাঝে কোথাও দেখিনি যে সূর্য ঘুরছে (অবশ্য বিশ্বাসীদের মতামত ছাড়া)। এর উপরই চলছে দ্বন্দ্ব। আমিও তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিভিন্ন প্রমাণ উত্থাপন করে এটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সূর্য ঘোরে। এ শর্তটি পেয়ে আনন্দ হলো। বিজ্ঞানীরা এতদিন পরে আবার একটু একটু করে সত্যের পথ ধরছে। স্থির সূর্যকে আঘাত মেরে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এখন সামান্য একটু বাকী আছে। লেখা ও বলার দিক থেকে, মনের দিক থেকে নয়। কেননা মন কোন দিনই বলে না যে পৃথিবী ঘোরে। এটা অনুভূতি শক্তির সম্পূর্ণই বিপক্ষে। অনুভূতি শক্তি বলে অসাধারণ এক শক্তি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন যা দিয়ে শতকরা ৯০ ভাগ জ্ঞান আহরণ হয়। আর এই জ্ঞানের বলেই মানুষ ধরাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে। এ অনুভূতিকে বাদ দিলে বা বিশ্বাস না করলে বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞানের পথে বাধা আসে, সত্যের দ্বার রুদ্ধ হয়। এ অনুভূতির মাধ্যমে বিশ্বাস করার জন্য আছে পঞ্চেন্দ্রিয়। এরা নিষ্ক্রিয় নয়। শব্দ শোনা যায়, দেখা যায় না, আত্মা দেখা যায় না, তাপ, বিদ্যুৎ, ব্যথা, বেদনা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মোহ, মায়া, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই ল্যাবরেটরীর প্রমাণে মেলে না। অথচ অনুভূতির মাঝে এদের আটকিয়ে ফেলা যায়। এ অনুভূতি প্রতিটি বিষয়ের কাছেই সত্য। শুধু অসত্য পৃথিবী ঘোরার কাছে। ৭০ হাজার মাইল বেগ নিয়ে যে পৃথিবী ঘুরছে তা আমাদের অনুভূতিতে আসে না। এখানে এসে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে যায়। অর্থাৎ এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঘুরছে বুঝতে পারি। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত হচ্ছে বোঝা যায়। এই ওপরের মোটরগাড়ি, রিক্সা, গরুর গাড়ি, ট্রেন, বাস, সাইকেল, নৌকা, স্টিমার যেটাতে আরোহণ করা হোক বোঝা যায়। শূন্যের উড়োজাহাজে বা হেলিকপ্টারে বসে থাকলেও বোঝা যায়। এক ফিট ওঠানামা করলে ভয়ে কম্পন উপস্থিত হয়। আর পৃথিবী নাগর দোলার

মত ঘুরছে, নাচছে, দুলছে সূর্যের চতুর্দিকে রকেটের চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে খেলছে অথচ কিছুই বোঝা যায় না। ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস (পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যর্থ, আল্লাহর সৃষ্টিও যেন ব্যর্থ। হায়রে হতভাগা মানুষ)।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই সব অবিশ্বাসী ভাইদের যারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, বিদ্যাবুদ্ধিকে জলাঞ্জলী দিয়ে, কোরআনকে অশ্রদ্ধা করে গ্যালিলিওকে খুশী করার জন্য বলে থাকেন যে পৃথিবী স্থির নয়, তাঁরা কি উত্তর দিতে পারবেন যে পৃথিবী ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘোরে বোঝা যায় না, অথচ সামান্য একটু ভূমিকম্প হলেই সবাই চিৎকার শুরু করে দেয় কেন? পৃথিবীর আলোড়ন বোঝা যায় না। ভূমিকম্পের তাণ্ডব-লীলা অনুভব করেন কিরূপে? তখন আপনার ইন্দ্রিয় ঠিকই থাকে। শুধু বেঠিক হয় পৃথিবী স্থির বললে। এবারে আসুন দেখি অঙ্ক করে আপনাদের একটু চেতনা এনে দিতে পারি কিনা।

রকেট ও পৃথিবী

বিংশ শতাব্দীতে একথা বললে সবাই বিশ্বাস করবে যে রকেট নিয়ে চাঁদে অভিযান করা হয়েছে। রকেটের সাহায্যেই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা হয়েছে। কিভাবে, সে আলোচনা আমি এখানে করছি না। শুধু রকেট কিভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরেছে এবং কতটুকু গতিবেগ নিয়ে, এগুলোই আলোচনা করব। পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছেড়ে যে গতিতে রকেটকে ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে হয়েছিল তার গতিবেগ ছিল প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল। অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল প্রায়।

পৃথিবীর চতুর্দিকে রকেট যে গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে তা ছিল

৪·৩৯ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিবেগ নিয়ে হিসাব করলে, দেখা যায় ঘণ্টায় এর গতিবেগ দাঁড়ায়—

৪·৩৯ × ৬০ × ৬০ = ১৫,৮০৪ মাইল

= ১৬,০০০ মাইল (**A**pprox.)
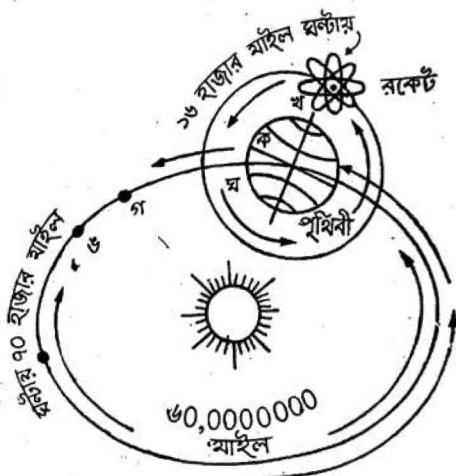
এদিকে ৩৬৫ দিনে সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল পথ ঘুরে আসতে তাকে ঘণ্টায় ৬৮,৫০০ মাইল বেগে দৌড়াতে হয়, ধরলাম ৭০,০০০ মাইল (**Approx.**)। পৃথিবী হতে ১,১০০ মাইল উর্ধ্বে থেকে রকেটকে ঘুরতে হয়েছিল। এই ১১ শত মাইল উর্ধ্বে উঠতে এর সময় লেগেছিল কমপক্ষে ১,১০০ মাইল + ৭ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে)= ২·৬১ মিনিট [ক ও খ এর দূরত্ব = ১,১০০ মাইল]

এখন রকেটটি 'ক' স্থান হতে নিক্ষিপ্ত হবার পর ২·৬১ মিনিটে পৃথিবী সরে আসে প্রায়—

২·৬১ × ১,০০০ মাইল = ২,৬১০ মাইল [প্রতি মিনিটে পৃথিবীর গতি প্রায় ১ হাজার মাইল] (তার গতি পথে অর্থাৎ 'গ' স্থানে)

পৃথিবী যখন 'গ' স্থানে এসে পেঁছায় তখন রকেট 'খ' স্থান থেকে ঘুরতে শুরু করে। 'ঘ' স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথে পেঁছাতে আরও প্রায় ৪ মিনিট সময় প্রয়োজন। এ ৪ মিনিটে পৃথিবী আরও ৪,০০০ মাইল দূরে এসে পেঁছাবে। অর্থাৎ গন্তব্য স্থান থেকে পৃথিবী সরে যখন ২,৬১০+৪০০০=৬,৬১০ মাইল আসে তখন রকেট মাত্র 'ঘ'-তে এসে পেঁছায়। যে রকেট ঘণ্টায় ১৬,০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে চক্রাকারে ঘোরে তা কি করে ৭০ হাজার মাইল বেগ বিশিষ্ট পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরবে? অংকশাস্ত্রমতে আমরা তা অসম্ভব দেখছি।

যেহেতু রকেটের গতির চেয়ে পৃথিবীর গতি অনেক বেশী তাই রকেটটি পৃথিবীর গতিপথের সম্মুখে পড়লে সংঘাত অনিবার্য। আর যদি একবার পিছনে পড়ে তবে পৃথিবীকে আর জন্ম জন্মান্তরেও ধরতে পারবে না। অংকশাস্ত্র[১] মতে আমরা এটাই দেখতে পাই। এর ব্যতিক্রম হতে পারে কিনা, সম্ভব কিনা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের তা বোঝাবেন।

চাঁদের জন্ম

চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় কেননা বৈজ্ঞানিকদের ধারণা চাঁদ এক সময় পৃথিবীর সঙ্গেই মিলিত ছিল। কোন এক সময়ে কোন কোন কারণে বা কি গরমিলের ফলে যে চাঁদ পৃথিবী ছেড়ে শূন্যে চলে যায় সে তত্ত্ব আমরা জানতে পারি না। তবে এটাই

টীকা : ১। Let the Escape velocity be Ve

Then $Ve = \sqrt{2.g.r}$ where g=32ft per sec.

$= \sqrt{2 \times 32 \times 3960}$ r=39 .0 miles.

= 7 miles per sec. = distance from the centre of the Earth

আমাদের শৈশবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগর থেকেই চাঁদের জন্ম হয়। চাঁদের আদিম জননী পৃথিবী। এই জননী সেবাতেই সে জন্ম জন্মান্তর থেকে রত আছে। বৈজ্ঞানিকদের এ মতবাদকে সমর্থন দিতে গিয়ে জর্জ ডারউইন আরও বিশেষভাবে পরিশ্রম করেছেন। তিনি তাঁর গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে প্রায় ৪×১০^{১০} বছর পূর্বে চাঁদ প্রকৃতই পৃথিবীর সংস্পর্শে ছিল।[১] সে সময় নাকি চাঁদের এক মাস পৃথিবীর এক দিনের সমান ছিল। আর উভয় দিনের দৈর্ঘ্য বর্তমান দিনের সাত ঘণ্টার সমান ছিল।

জর্জ গ্যামো লিখেছেন :

"সেই আদিম যুগে সূর্যের বেলোর্মি আকর্ষণে জননী দেহের যে স্থান হইতে নির্গত হইয়া চাঁদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পৃথিবী পৃষ্ঠের ঠিক সেই স্থানের উপরেই সে স্থির হইয়াছিল। আমাদের উপগ্রহের এই বাল্যকালকে আমরা সঙ্গতভাবে হাওয়াইয়ান চাঁদ বলিতে পারি। কেননা যতদূর সম্ভব প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য-স্থলেই ছিল চাঁদের জন্মস্থান। প্রশান্ত মহাসাগরের জঠর যে মাতা-বসুন্ধরার কঠিন ত্বকে একটি বিরাট ক্ষতছাড়া আর কিছুই নয়, এবং ইহা যে তাহার প্রথমা ও একমাত্র কন্যার জন্মকথা সর্বদা মনে করাইয়া দেয়, এরূপ অনুমান করিবার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"[২]

জর্জ গ্যামো যে ভাবে লিখেছেন তাতে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কেননা তিনি বলিছেন তাঁর হাতে এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণগুলো আমরা পাইনি বলে কৌতূহলপূর্ণ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা বেশ একটু অস্বস্তির মধ্যেই কাটাচ্ছি। প্রমাণগুলো হাতে থাকলে অন্তত বিংশ শতাব্দীর গর্বিত বৈজ্ঞানিকদের ও

টীকা : ১ ও ২। জগৎ ও মহাজগৎ—জর্জ গ্যামো, তর্জমা এম. এ. জব্বার-পৃষ্ঠা ১৫—১৬।

নভোচারীদের ঘায়েল করা যেত। কেননা এরা স্বীকার করতে চান না যে চাঁদ পৃথিবী হতে জন্ম নিয়েছে। তাদের মতে চাঁদের বয়স প্রায় ৪৫০ কোটি বছর। পৃথিবীর বয়স যেখানে তারা দেখাচ্ছেন ৩৫০ কোটি বছর সেখানে চাঁদের বয়স ৪৫০ কোটি বছর হলে বিজ্ঞানীদের নতুন সুরে আবার বলতে হয় যে চাঁদ পৃথিবীর প্রথমা ও একমাত্র কন্যা নয় এবং পৃথিবীর গর্ভ প্রশান্ত মহাসাগর হতে তা জন্মও নেয়নি। দেখুন আমার এ কথাগুলোর সত্যতা আছে কিনা এবং বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের সুর পাল্টিয়েছেন কিনা। এপোলো ১১-এর নভোচারীগণ চাঁদ হতে যে পাথরগুলো নিয়ে আসেন তাদের বয়স হিসেব করে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে যান। দেখতে পান পাথরগুলোর বয়স পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন পাথরের বয়সের চাইতে বেশী। বিস্ময়ে তাঁরা অনুভূত হয়ে পড়েন। বলতে বাধ্য হন, **চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল তা সব ভুল**। তাঁদের এ কথাগুলো চতুর সাংবাদিকরা রেকর্ড করে ফেলেন এবং সারা দুনিয়া ব্যাপী **"বিজ্ঞানীদের বিস্ময়"**—এ শিরো নামায় প্রচার করেন। এ প্রচারভঙ্গি ছিল নিম্নরূপ। (**"বিজ্ঞানীদের বিস্ময়"**)—'পৃথিবীর যে কোন প্রস্তরের চাইতে চন্দ্র- প্রস্তর অধিক প্রাচীন।"[১]

"ওয়াশিংটন, ১৬ই সেপ্টেম্বর একাদশ এপোলোর অভিযাত্রীগণ কর্তৃক আনীত কতিপয় চন্দ্র-প্রস্তরের বয়স পৃথিবীর যে কোন প্রস্তরের চাইতে বেশী হইবে বলিয়া গতকাল বিজ্ঞানীদের এক রিপোর্টে জানা গিয়াছে।"

"নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং এডুইন অলড্রিন, এবং মাইকেল কলিন্স দুই মাস আগে তাঁহাদের যুগান্তকারী অভিযান শেষে চন্দ্রের যে সমস্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকা লইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

টিকা : ১। [ইত্তেফাক ১৪ বর্ষ ২১২তম সংখ্যা। ঢাকা, বৃহস্পতিবার ৩রা আশ্বিন ১৩৭৬ বাংলা। ৫ই রজব ১৩৮৯ হিঃ]

এই রিপোর্টে বলা হয়, "কয়েকটি চন্দ্র প্রস্তরের বয়স অনুমান করিয়া বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন এই পাথরগুলি ৪৫০ কোটি বৎসরের পুরাতন হইবে। চন্দ্রের অন্য কোন স্থানে হয়ত ইহার চাইতেও বেশী বয়সের পাথর পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।"

মহাশূন্য এজেন্সীর রিপোর্টে বলা হয় "ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এই পাথরগুলিকে স্ফটিক আকারে পরিণত করিবার সময় এইগুলির আসল বয়স নির্ণয় করা যাইবে যে কোন প্রাচীন প্রস্তরের চাইতে সম্ভবত এইগুলির বয়স আরও অনেক বেশী হইবে।"

"চন্দ্র প্রস্তরের এই বয়স দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এপোলো ১১-এর নভোচারীরা চাঁদের যে শান্তি সাগর এলাকায় অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা সাম্প্রতিক কোন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয় নাই। **এতদিন এই বিষয়ে মানুষের যে ধারণা ছিল তাহা ভুল। আবার পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ছিটকাইয়া গিয়া চাঁদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া যে ধারণা পোষণ করা হইত তাহাও হয়ত এই বয়স সংক্রান্ত তত্ত্ব দ্বারা ভুল প্রমাণিত হইবে।**

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পলগ্যাস্ট সংক্ষেপে তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা এইরূপও মনে করিতে পারি যে, **সূর্য হইতে একই সময়ে নিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে।** তবে আলাদাভাবে বিবেচনা করিলে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে।" তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, **"চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইসব মতবাদ নিতান্তই জল্পনা কল্পনা মাত্র।** কেননা চন্দ্র নমুনা পরীক্ষা করিয়া প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সুদূরতম অতীতকালের প্রতি আলোকপাত করা যায় না।"

এবারে সবার বুঝতে হয়ত আর কষ্ট হবে না যে, বিজ্ঞানীদের প্রমাণ বিহীন যেসব থিওরী বা অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার সত্যতা কতটুকু। এজন্যই যুগে যুগে এসব চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে থাকে। এক বৈজ্ঞানিক অন্য বিজ্ঞানীদের থিওরী

ভুল বলে আখ্যায়িত করেন এবং নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এই জন্য আমি বলেছি যে কাল্পনিক সূত্রগুলোর উপর চিন্তা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এগুলোকে বেদবাক্য মনে না করে আল্লাহ ও রছুলের বাণীর মাধ্যমে আমরা সমাধান করব, যা হবে নির্ভুল।

চাঁদের উৎপত্তির ইতিহাস পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকগণ যা দিয়েছিলেন তা কি এখন সত্য বলে কেউ বিশ্বাস করবেন? চাঁদের জন্ম কি পৃথিবী জন্মের পূর্বেই হয়েছে? চাঁদ কি পৃথিবীর প্রিয়তমা কন্যা? প্রশান্ত মহাসাগরই কি এর গর্ভস্থল? অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসে কি এবার ফাটল ধরছে না? জানি অবিশ্বাসীদের অতি সহজেই এতে বিশ্বাস আসবে না। কেননা কোরআন হাদিসের কথার চাইতেও বিজ্ঞানীদের কথায় এদের মনে বেশী করে দাগ কাটে। আমরা কিন্তু ডঃ পলগ্যাস্ট-এর শেষ কথাটাকে বিশ্বাস করতে রাজী না। **চাঁদের বয়স যে পৃথিবীর বয়সের চেয়ে বেশী একথাও মোটেই সত্য নয়। কেননা বাইবেলে দেখলাম যে সৃষ্টির প্রথম দিকে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আর চতুর্থ দিনে চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে।** এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি পৃথিবী সৃষ্টির পরে হয়েছে। কোরআনও সে কথারই সাক্ষ্য দেয়। সূরা সাফাফাত ও সূরা মোলকে বলা হয়েছে, "পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে।"

কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলে তাকে সুশোভিত করার প্রশ্ন হয় না একটি ইমারতের ভিত্তি না দিয়ে ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিট করে, গাছ-গাছড়া বা অন্যান্য আসবাব দিয়ে সুশোভিত করার যুক্তি পাগলের যুক্তি। এটা কোন বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাশীল ব্যক্তির যুক্তি হতে পারে না। তাই চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি যে পৃথিবী সৃষ্টির পরে হয়েছে এটাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি যার সঙ্গে কোরআন ও হাদিসের মিল আছে।

চন্দ্র যেমন পৃথিবী হ'তে সৃষ্টি হয়নি তাই এটা পৃথিবীর

উপগ্রহ নয়, তেমনি পৃথিবীও সূর্য হতে জন্ম নেয়নি। পৃথিবী সূর্যের উপগ্রহ নয়। উপগ্রহ না হলে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরবার প্রশ্ন অমূলক, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

চাঁদ কেন তার কক্ষের উপর ঘোরে ?

আমি বললাম চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ নয়। এতদিন পর বৈজ্ঞানিকরাও সে যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন ; কেননা তাঁরা আজ স্বীকার করেছেন যে চাঁদের জন্ম পৃথিবী হতে হয়নি। তা হলে কৌতূহলী বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানীদের মনে এ প্রশ্ন স্বভাবতই আসবে যে চাঁদ কেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার কক্ষপথে ঘুরছে ?
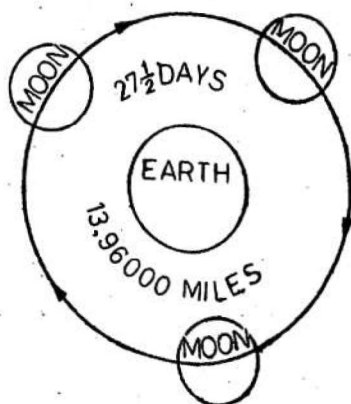
চিত্র নং ঃ ৭

আসুন বিজ্ঞানের যুক্তিতেই এ প্রশ্নের সমাধান করি। চাঁদ যে কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে ২৭½ দিনে একবার ঘুরে আসে সে কক্ষপথের দূরত্ব ১৩,৯৬,০০০ (তের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) মাইল।

এর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২,২৮৭ মাইল। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটনের মহাকর্ষণ সূত্রে বলা হয়েছে ঃ

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$\text{i. e. } F = G.\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

Where, m_1 = mass of one body.

m_2 = mass of second body.

d = distance between the two.

F = force of attraction.

যেহেতু পৃথিবীর ভর চাঁদের চেয়ে অনেক বেশী, তাই চাঁদ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হবে।

The force will never become zero, therefore the moon 'M' will always he pulled towards Earth, E.

যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ তার এই কক্ষপথে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্বের যে ব্যবধান থাকবে তার কোন পরিবর্তন হবে না।

এখন অবশ্য আর একটি প্রশ্ন আসতে পারে—যেহেতু পৃথিবী তার বৃহত্তর শক্তি নিয়ে চাঁদকে তার দিকে টানছে তবে কেন চাঁদ—পৃথিবীর বুকে পতিত হয় না ?

চলুন নিউটনের 'LAW OF MOTION' নিয়ে আলোচনা করে এর সমাধান খুঁজে বের করি।

First Law-তে বলা হয়েছে—

"Every body continues in its state of rest or of motion until it is impress by another force to change its state."

এর অর্থ এই যে যদি কোন বস্তুর উপর বাইরে থেকে কোন শক্তি প্রয়োগ করা না হয়, তবে বস্তুটি হয় স্থির থাকবে নতুবা তার গতিপথে সরলরেখা ধরে চলতে থাকবে।

যদি শক্তি দুটি Balanced হয় তবে বস্তুটি সরলরেখায় চলবে আর যদি Unbalanced হয় তবে বস্তুটি বৃহত্তর দিকে Gurve path-এ চলবে অর্থাৎ চক্রাকারে ঘুরবে।

নিম্নে একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ
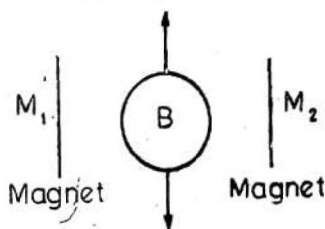
চিত্র নং ঃ ৮

galanced force M_1 and M_2 in this case the body will move in a straightline.

এবারে চাঁদ ও পৃথিবীর অবস্থা দেখি ঃ
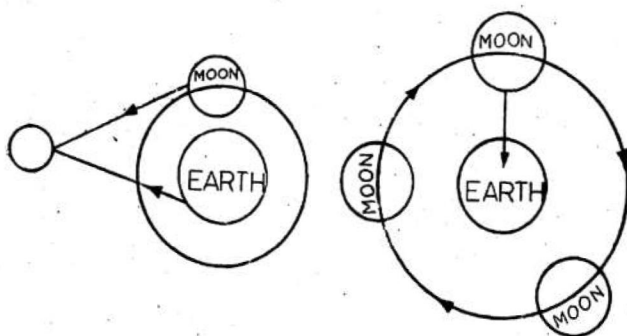
চিত্র নং ঃ ৯

The force exerted upon the moon is the gravitational attraction of the Earth. This force is unbalanced and can never be balanced by any other force.

অর্থাৎ চাঁদের উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে তা unbalanced (অসমতার) অবস্থাতেই আছে। বাইরে থেকে কোন শক্তি প্রয়োগ করেও তাকে balanced করা যাবে না।

এবারে চাঁদের গতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি আমাদের মনে আছে। সূত্রটিতে বলা হয়েছে ঃ

"Rate of change of momentum is proportional to its impress force and takes place in the direction in which the force acts."

i. e P=MF.

যদি কোন বস্তুকে ডানদিকে ধাক্কা দেওয়া যায় তবে বস্তুটি ডান দিকেই চলতে থাকবে। যত জোরে আঘাত দেওয়া হবে ঠিক তত জোরেই চলবে। এটাকে বলা হয় Law of Acceleration.

When a body is accelerated it may move faster or slower. It may move in different direction or it may do both.

The only force exerted on the moon is the gravitational attraction of the Earth. This force is towards Earth (E) and so the Moon (M) must be accelerated towards Earth.

পৃথিবীর ঘূর্ণন আছে কিনা, এর বিভিন্ন গতি থাকতে পারে কি না এটা প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণ করার জন্যই চাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাকে তুলে ধরতে হয়েছে। অনেকেই হয়ত মনে করবেন যে পৃথিবী ঘূর্ণনের সঙ্গে চাঁদকে পাশাপাশি আনা হলো কেন এবং এতগুলো কথাই বা জানবার কি প্রয়োজন ছিল ?

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একটু মনোযোগ দিয়ে চাঁদের ঘূর্ণনের অবস্থাটা দেখুন। এটা বুঝতে কারোরই কষ্ট হবে না—বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা না করলেও এতটুকু জ্ঞান সবারই হবে যে, চাঁদ

পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর চতুর্দিকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথের উপর ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে (Due to unbalanced force)।

কিন্তু নিজ নিজ কক্ষের উপর আবর্তন করে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে না। অর্থাৎ তার আহ্নিক গতি নেই। এই আহ্নিক গতি থাকার কোন বৈজ্ঞানিক কারণও নেই। কেননা এই চাঁদের উপর পৃথিবীর gravitational attraction ছাড়া আর কোন শক্তি এর ওপর নেই। এই শক্তিটা শুধুমাত্র পৃথিবীর দিকে টেনে নেবার শক্তি। যেহেতু চাঁদেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে তাই পৃথিবীর বুকের ওপর না পড়ে একটি মাত্র গতি নিয়েই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝেও ঘূর্ণন ক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে (বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুযায়ী। আসল কারণ আল্লাহ পাকই ভাল জানেন)। তাই সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীকে ঘোরানোর কল্পনা করা হলেও এর আহ্নিক গতি থাকার কোন যুক্তি নেই। **যাঁরা এ যুক্তি দেখিয়েছেন তাঁদের চিন্তাধারা অবৈজ্ঞানিক ও মহাকর্ষ সূত্র বিরোধী।**

Facts about the moon (চাঁদের কিছু তথ্য) :

Diameter = 2160 miles.

Volume = $\frac{1}{49}$th of the Earth.

Mass = $\frac{1}{81}$th of the Earth.

Density = 3·3

Surface gravity = $\frac{1}{6}$th of the Earth.

Velocity of scape = 1·5 miles per sec.

Velocity of motion = 2287 miles per hour.

Distance from the Earth = 25,270 miles greatest

2, 21,463 least. 2, 38,857 mean.

Revolution period = 29d. 12h. 44m. 2·8 sec.

Synodic period (phase to phase) 27d. 7h. 43m.

11·5 sec Siderial (True period)

Rotation period = 27d. 7h. 43m. 11·5 sec.

Stellar Magnitude = 12·6 brightest.

Aldedo = 0·07

Distance from Farth centre = $\frac{1}{400}$ times nearer than Sun.

পৃথিবীর জন্মতত্ত্ব

কতদিন আগে যে এ পৃথিবীর জন্ম হয়েছে তা বলা কঠিন। কেননা কোন নবী, পয়গম্বর বা কোন দার্শনিকই পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে কোন কিছু বলেননি। তবে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় তিন শত পঞ্চাশ কোটি বছর। বৈজ্ঞানিকদের এ সিদ্ধান্তও যে চূড়ান্ত নয়, একথাও সত্য। কেননা, বিভিন্ন যুগের বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতবাদই তা প্রমাণ করে। কিছুদিন আগে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে উত্তর মহাসাগরে একটি জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তার বয়স হিসেব করে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ছয় শত কোটি বছর। এখন সবার মাথায়ই এ প্রশ্ন জাগবে যে পৃথিবীর বয়স মাত্র তিন শত পঞ্চাশ কোটি বছর (বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী), অথচ এ জীবটির আবির্ভাব ছয় শত কোটি বছর পূর্বে কেন? তবে কি পৃথিবীর জন্মের পূর্বেই এ জীবটির জন্ম হয়েছিল? যদি পৃথিবী জন্মের পূর্বেই এ জীবটির জন্ম হয়ে থাকে তাহলে আমার বলবার কিছুই থাকে না। আর যদি সবাই আমার মতো বলেন যে, পৃথিবী জন্মের পূর্বে জীবজন্তুর আবির্ভাব অসম্ভব তাহলে বলতে হবে যে বৈজ্ঞানিকদের কাল্পনিক চিন্তাধারা বাস্তব বিরোধী। পৃথিবী জন্মের ইতিহাস আমরা জানি না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এ পৃথিবী জীবজন্তু মনুষ্যবাসের উপযোগী ছিল না। এ তত্ত্বটা রছুলুল্লা (দঃ)-এর বাণী হতে মিলে যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি।

বৈজ্ঞানিকদের অভিমত যে, কোন এক সময়ে সূর্যের সঙ্গে 'ভেগা' নক্ষত্রেরও বিরাট এক সংঘর্ষ হয়। আর সেই সংঘর্ষের ফলেই সূর্যের কিছু অংশ ছিট্‌কিয়ে পড়ে। এই ছিট্‌কিয়ে পড়া একটা অংশ আমাদের এই পৃথিবী। তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সূর্যের মধ্যে যেসব উপকরন আছে সেসব উপকরণ পৃথিবীর

মধ্যেও আছে। কারণ সূর্য হতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। কিন্তু দেখা যায় যে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কোনই মিল নেই। সূর্য একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। আর পৃথিবী জলে, স্থলে এবং হাওয়ায় মিলে একটা সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র পদার্থ। এর গুণাগুণ এবং বৈশিষ্ট্য সূর্যের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য হতে পৃথক। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা পৃথিবী যখন ছিটকিয়ে পড়ে তখন তার উত্তাপ ছিল ১২,০০০ ডিগ্রী। তারপর আস্তে আস্তে তাপ বিকিরণ করতে থাকে এবং পরিশেষে জল, স্থল ও কঠিন পদার্থের রূপ নেয়। এরপর তরুলতা ও জীবজন্তুর জন্ম হয়। একটা অগ্নিপিণ্ড তাপ বিকিরণ করতে করতে হয় তরল না হয় কঠিন একটা মাত্র পদার্থের রূপ ধারণ করে কিন্তু একই সূর্যের বিচ্যুত কিছুটা অংশ তাপ বিকিরণ করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি করে কি করে? হাওয়ার যে উত্তাপ, জলের উত্তাপ সেটা থেকে পৃথক। আবার জলের উত্তাপ, মাটির উত্তাপ থেকে পৃথক। মাটির উত্তাপ আবার তরুলতা, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির উত্তাপ থেকে পৃথক। সূর্যের বিচ্যুত অংশটা একই হারে, একই গতিতে তাপ বিকিরণ করবার অন্তরায় সৃষ্ট করল কে? দেখি দু-একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণে এ গোলক ধাঁধার অবসান করা যায় কি না।

আদমের (আঃ) ছিটকানো অংশ আজকালকার মানবকুল। আদমকে যদি সূর্য আর আমাদেরকে যদি পৃথিবী মনে করি তাহলে বোধহয় বিশেষ অন্যায় করা হবে না। কোটি কোটি বছর আগে আদমের (আঃ) যে রূপ, গুণ ও স্বভাব ছিল কোটি বছর পরের আদম বুনিয়াদির মধ্যেও ঠিক সেই রূপ, সেই গুণ ও সেই স্বভাবই বিদ্যমান। আদমের চোখ, মুখ, নাক, কান যা ছিল আমাদেরও ঠিক তাই আছে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে আদম (আঃ) যেমন লম্বা আকৃতির ছিলেন, আজকালকার মানুষ তত লম্বা আকৃতির নয়। তাছাড়া মানুষ হিসেবে স্বভাব ও গুণাগুণ ঠিকই আছে। আদম (আঃ) মানুষ ছিলেন। তার বংশধর

আজও মানুষ রূপেই বাস করে। চতুষ্পদ বিশিষ্ট কোন জানোয়ার বা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট কোন বৃক্ষ বা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে কোন জলকণার রূপ নিয়ে আজও আমরা সূর্যের ন্যায় রূপ বদলাইনি। কোটি বছর আগে যা ছিলাম আজও তাই আছি। রূপ, গুণ ও উপাদানের কোন পরিবর্তন হয়নি।

সূর্যের সঙ্গে 'ভেগা' নক্ষত্রের সংঘাতে শুধু পৃথিবীরই জন্ম হয়নি, একই সঙ্গে অন্যান্য গ্রহদেরও জন্ম হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে পৃথিবীর অনেকটা মিল থাকা উচিত ছিল। কেননা, **একটা আগুনের উৎস থেকে যদি হাজারো আগুন বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে, প্রতিটি আগুনের স্বভাব ও গুণাগুণ একই**। কিন্তু আশ্চর্য একই সঙ্গে ছিট্‌কিয়ে পড়া অন্যান্য গ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে কোনই মিল নেই। এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকরাই দিয়েছেন। এমনকি পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী মঙ্গল গ্রহের সঙ্গেও তার আকাশ পাতাল প্রভেদ। পৃথিবীর প্রতিবেশী চাঁদে অভিযান করেও দেখা গেছে যে পৃথিবীর উপকরণ ও চাঁদের উপকরণ সম্পূর্ণই পৃথক। তাহলে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণবিহীন কাল্পনিক সূত্রগুলো ভিত্তিহীন। কোরআনও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে—"**সত্যের সম্মুখে কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না**।" [সূরা নজম]

তাই সেগুলো আমরা বাস্তব বলে মেনে নিতে রাজী না। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে বলে অনেকেরই ধারণা। কিন্তু একই সঙ্গে ছিট্‌কিয়ে পড়া অন্যান্য গ্রহের যেমন **বুধ ও শুক্রের 'আহ্নিক গতি'** নেই। পৃথিবী, বৃহস্পতি, নেপচুন ও শনি গ্রহ পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে অথচ একই সঙ্গে ছিট্‌কিয়ে পড়া ইউরেনাস গ্রহ কেন পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে এ প্রশ্নের বিজ্ঞানীদের কোন সমাধান নেই। কোন মানুষের দেহ হতে দুটি পা বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে একটি পূর্ব দিকে আর একটি পশ্চিম

দিকে, একটি নিশ্চল আর একটি সচল হয়ে লাফালাফি করবে এ কোন্ ধরনের যুক্তি ? যদি বুধ, শুক্র ও অন্যান্য গ্রহের আহ্নিক গতি না থাকে তবে বলতে হবে যে পৃথিবীরও কোন আহ্নিক গতি নেই। যদি কোন গ্রহ পশ্চিম দিকে আর কোন গ্রহ পূর্ব দিকে দৌড়াদৌড়ি করে তবে বলতে হবে যে সৌরজগতে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। তাই কি ? যদি সৌরজগতে এমন বিশৃঙ্খলা থাকত তাহলে এ বিশ্ব ক'দিন টিকে থাকত ? একটির সঙ্গে অন্যটির সংঘাতে কি ধ্বংস হয়ে যেত না ? এ বিশ্ব বিশৃঙ্খল নয়। শৃঙ্খলার শৃঙ্খল পরেই প্রতিটি সৃষ্টি আপন আপন কার্য সম্পাদন করছে। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ নিয়ম যেমন সৃষ্টির পর থেকেই চলছে তেমনি প্রলয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত চলবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই ঘুরছে তাদের নিজস্ব কক্ষপথে। কোরআন কি সুন্দর ভাবেই না এর ব্যাখ্যা দিয়েছে।

"সূর্যের এমন সাধ্য নাই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে অথবা রজনী দিবসকে অতিক্রম করিবে। এবং প্রত্যেকেই নভোমণ্ডলের মধ্যে পরিক্রম করছে।" [সূরা ইয়াছিন। আয়াত ৪০]

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি যদি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য একথা অন্যায় হলেও বলা চলে যে পৃথিবীর জন্ম সূর্য থেকে হয়েছে। কিন্তু যদি একথা প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী সৃষ্টির পর আকাশ সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই পৃথিবী সৃষ্টির পরে সৃষ্টি হয়েছে তা হলে যারা বলে যে সূর্য থেকেই পৃথিবীর জন্ম তাদের কিন্তু চিন্তাধারায় ঘুন ধরবে আর মাথা চুলকিয়ে ডক্টর পলগ্যাস্ট-এর মতো বলতে হবে—
"এ যাবৎ আমরা যা বলেছি সব ভুল।"

যে তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানবহির্ভূত, যে তত্ত্বে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি না—সে তত্ত্বের সন্ধান জানতে হলে সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ঘাটনকারীর অভিমতই প্রয়োজন যে অভিমত হবে সর্বজন স্বীকৃত। চলুন, তাহলে দেখি আদি সৃষ্টিকারী আল্লাহ

কি তত্ত্ব আমাদের জন্য পরিবেশন করেছেন তাঁর মহাবাণী কোরআনে, যেখানে বলা হয়েছে—

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি আকাশের প্রতি অভিনিবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশ সংবিন্যস্ত করিলেন। এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" [সূরা বকর। আঃ ২৯]

একটি ভুল সিদ্ধান্তকে যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই মেনে নেয় তবু সেটাকে ভুল ছাড়া সত্য বলা অন্যায় হবে। পৃথিবীর জন্মতত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা শুধু ভুলই নয়—বিভ্রান্ত করবার মারাত্মক রকমের একটা প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টাকে কোন জ্ঞানী লোক মেনে নেবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে যারা মুসলমান তারা এরূপ বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কারণ এরূপ ভুল সিদ্ধান্তকে কোরআন মেনে নিতে নিষেধ করেছে নিম্নোক্ত বাণীতে—

"এবং যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর—তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে। **তাহারা কল্পনা ব্যতীত অনুসরণ করে না। এবং কেবল মাত্র অনুমান করিয়া থাকে।"** [সূরা আনআম। আয়াত ১১৬]

আমার সামান্য চিন্তাধারার মাধ্যমে রচিত—**'বিজ্ঞান না কোরআন'** বইটিতে এরূপ সমস্যাবহুল অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতেই সেগুলোর সমাধান দিতে চেষ্টা করেছি। উপরন্তু দিয়েছি কোরআন থেকে অজস্র বৈজ্ঞানিক সূত্র যেগুলো সুষ্ঠু চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে আশা করি। তরুণ ভাই-বোনদের অনুরোধ করছি বইটি পড়তে ও সেখান থেকে বাস্তব চিন্তাধারা নিয়ে নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

সূর্য হতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বলেই পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে এই যে ভ্রান্ত ধারণা এর অবসান করেছে কোরআন।

এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সৃষ্টিই সর্বপ্রথম। এরপর অন্যান্য সৃষ্টি। প্রতিটি সৃষ্টিই স্বতন্ত্র। তবে পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করেই হয়েছে অন্যান্য সৃষ্টি। যার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সৃষ্টি তার জন্যই অন্যেরা কার্যে নিয়োজিত থাকবে। যেহেতু পৃথিবীর জন্যই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি—তা পৃথিবীর চতুর্দিকেই তারা ঘুরবে—পৃথিবী নয়। দেখুন বাইবেলে কি বলে।

"প্রভু তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছ, আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তে রচিত।" [বাইবেল—ইব্রীয় ১/১০]

বাইবেলের আদি পুস্তক : জগৎ সৃষ্টির বিবরণ

১। "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।"

২। "পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন।"

৩। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল।"

৪। "তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।"

৫। "আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ওঅন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

৬। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক।"

৭। "ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন।"

৮। "তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **দ্বিতীয় দিবস হইল**।"

৯। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ জল একস্থানে সংগৃহীত ও স্থল সপ্রকাশ হউক। তাহাতে সেইরূপ হইল।"

১০। "তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন আর ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম।"

১১। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ, বীজ উৎপাদক ঔষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফল বৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক।"

১২। "তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ভূমি, স্ব স্ব তৃণ, জাতি অনুযায়ী সজীব ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।"

১৩। "আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **তৃতীয় দিবস হইল**।"

১৪। পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমন্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক। সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক।"

১৫। "এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দেওয়ার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক। তাহাতে সেইরূপ হইল।"

১৬। "ফলত ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে **এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি এই দুই বৃহৎ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন**।

১৭। "আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির কর্তৃত্ব করণার্থে।"

'১৮। "এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।"

১৯। "আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **চতুর্থ দিবস হইল**।"

২০। "পরে ঈশ্বর কহিলেন জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণী হউক, এবং ভূমির ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক।"

২১। "তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন, পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।"

২২। "আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক।"

২৩। "আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **পঞ্চম দিবস** হইল।"

২৪। "পরে ঈশ্বর কহিলেন, 'ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক।' তাহাতে সেইরূপ হইল।"

২৫। "ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।"

২৬। "পরে ঈশ্বর কহিলেন আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।"

২৭। "পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন ; পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"

২৮। "পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের

পক্ষিগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীব-জন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।"

২৯। "ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজ উৎপাদক ঔষধি ও যাবতীয় স-বীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।"

৩০। "আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট এই সকল প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ঔষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।"

৩১। "পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আর দেখ সে সকলই উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **ষষ্ঠ দিবস** হইল। এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তু ব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর **সপ্তম দিনে** আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"

পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কি প্রমাণ এখান থেকে মিলছে? চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী তরুলতা ও মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিক পদ্ধতি ও সময়সীমার একটা সঠিক ধারণা কি আমরা নিতে পারছি? পবিত্র কোরআনের সঙ্গে এ সৃষ্টি পদ্ধতির কোন মিল আছে?

কোরআন এবং বাইবেল পাশাপাশি রেখে পড়ুন। দেখতে পাবেন বাইবেলের প্রকৃত বাণীগুলোর সঙ্গে কোরআনের সম্পূর্ণ মিল আছে। অবশ্য ইহুদী ও খ্রীস্টানেরা বাইবেলে যেখানে ছাট্ কাট্ করেছে সেগুলোর সঙ্গে নয়। কোরআন থেকে জানতে পাই যে এ বিশ্ব সৃষ্টিতে মোট **'ছয় দিন'**[১] সময় লেগেছে। বাইবেলেও

টীকা—১। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা **ছয় দিবসে** সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি আর্শোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত।
[সূরা ফোরকান, আয়াত ৫৯]

ঠিক তাই দেখা যাচ্ছে। কোরআনে দেখতে পাই যে আকাশ ও পৃথিবী ছিল মিলিত। প্রথম দিবসে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বাইবেলের প্রথম পংক্তিতে ঠিক এ কথারই উল্লেখ আছে। কোরআনে দেখতে পাই যে পৃথিবীকে সুশোভিত করতেই চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। বাইবেলে সৃষ্টির ধারাবাহিক রূপ বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে প্রথম দিবসে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করা হলো। আর এই পৃথিবীকে আলোকদান করার জন্য **চতুর্থ দিনে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে নির্মাণ করে আকাশের কোলে নিক্ষেপ করা হলো।**

যাঁরা বলে থাকেন যে সূর্য হতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে তাঁরা দেখুন কি ভ্রমাত্মক মতবাদ দিয়ে বিশ্বমানবকে ধোকা দিচ্ছেন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খ্রীস্টান যে কোন ধর্মের মানুষই আপনি হোন না কেন, যদি সামান্যতম বিশ্বাসও আপনার ধর্ম গ্রন্থের উপর থাকে তবে আর বলবেন না যে পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। পৃথিবী সূর্য হতে জন্ম নিয়েছে, তাই সূর্যের চারদিকে নাজেহাল হয়ে ঘুরছে—এ মতবাদ পরিহার করুন। সত্যের পথে আসুন। সত্যকে প্রকাশ করুন। সত্যকে সম্মুখে রেখে আপনি জ্ঞানের বিকাশ করুন। সবাই তা মেনে নেবে। আল্লাহর প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে আপনিও ধন্য হবেন।

সৃষ্টিতত্ত্বকে সঠিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা, সৃষ্টির অপরূপ মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলাই বৈজ্ঞানিকদের ধর্ম। আর এ ধর্মকে পেলেই মানুষ পায় প্রকৃত পথ, অপার সুখ ও আনন্দ। এ জন্য যুগে যুগে জন্ম হয় বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, অলি, গাউস, কুতুব, ফকির, মহামনীষী ও পয়গম্বরদের। তাঁদের দ্বারাই মানুষ পায় আলোর পথ, জটিল ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান।

গ্যালিলিও প্রমাণের কয়েকটি ফাঁক

পৃথিবী ঘূর্ণন সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রমাণ উত্থাপিত করা হয়েছে তা যে কোন চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকের কাছেই অপ্রচুর। যুক্তিসঙ্গত কোন অকাট্য প্রমাণই সেখানে নেই। প্রমাণগুলোর মধ্যে আছে—

(১) মহাশূন্যে কতকগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান প্রমাণ করে যে পৃথিবী ঘোরে।

এই অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ কি করে যে আজও বিজ্ঞান জগতে টিকে আছে তা সত্যি আশ্চর্য। পৃথিবীর চতুর্দিকে যে কোন বস্তু ঘুরলেই তা একবার দৃষ্টিপথে আসবে আবার দৃষ্টি বহির্ভূত হবে। পৃথিবীর নিকটতম কক্ষে ঘুরলে অতি অল্প সময়েই তা ধরা পড়বে আর বহু দূরবর্তী কক্ষে আবর্তন করলে বহুদিন পরই আবির্ভাব ও তিরোধান হবে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্র ঘুরলে যদি উদয়, অস্ত, ক্ষয় ও পূর্ণতা দেখা যায় তবে গ্রহ-নক্ষত্র লক্ষ কোটি মাইল পথ নিয়ে ঘুরলে তারা যে বহুদিন পর আবির্ভাব ও বহুদিনের জন্য তিরোধান হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই এবং এই প্রমাণই যে পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য যথেষ্ট তা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায়ই দোলা দেওয়া উচিত নয়। চলুন বাস্তব প্রমাণেই এর সত্যতা প্রমাণ করি।

আমি স্থির হয়ে উত্তর দিক মুখ করে দাঁড়ালাম। আমার চতুর্দিকে পাঁচজন বন্ধু বিভিন্ন পরিধির উপর আমাকে কেন্দ্র করে যদি ঘুরতে থাকেন তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম বন্ধুটি যিনি নিকটতম পরিধির উপর ঘুরছেন তিনি অতি শীঘ্র আমার সম্মুখে আসবেন ও চলে যাবেন। এইরূপে দূরত্বের তারতম্য অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আমার দৃষ্টির সম্মুখে পড়বেন। প্রথম ব্যক্তি ঘণ্টায় ১০০ বার সম্মুখে আসলে দ্বিতীয়

ব্যক্তি ঘণ্টায় ৮০ বার, তৃতীয় ব্যক্তি ৬০ বার, এইরূপে পঞ্চম ব্যক্তিকে ঘণ্টায় হয়ত মাত্র ১০ বার দেখা যাবে। তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে কক্ষের দূরত্বের উপর আবির্ভাব ও তিরোধানের সময় নির্ভর করে। এখন কি আমরা বলব যে আমি ঘুরি তাই তারা আমার দৃষ্টির সম্মুখে আসছে ও চলে যাচ্ছে? পৃথিবী স্থির বলেই চলন্ত বস্তুসমূহ তার দৃষ্টিপথে আসছে ও যাচ্ছে। অন্যথায় স্থির নক্ষত্রসমূহ যেমন ধ্রুব নক্ষত্র দৃষ্টি বহির্ভূত হতো। কিন্তু ধ্রুব নক্ষত্রের বেলায় নিশ্চুপ। তাই এ প্রমাণের গলদ প্রতিটি চিন্তাশীল লোকের কাছেই ধরা পড়া উচিত।

দ্বিতীয় প্রমাণে বলা হয়—

"সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে প্রত্যহ পূর্বাকাশে উদিত হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত যেতে দেখা যায়। পৃথিবী হতে সূর্যের গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এখন এই দূরত্বে থেকে নক্ষত্ররাজি পৃথিবীকে যে পথে প্রদক্ষিণ করতে হতো তা এমন বিশাল এক পথ যে, যে কোন প্রচণ্ড গতিতে চলুক না কেন নক্ষত্ররাজির জন্য তা চব্বিশ ঘণ্টায় অতিক্রম করা গণিত শাস্ত্রমতে একেবারে অসম্ভব। এটা হতে স্থির প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর ঘূর্ণন আছে।" **চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যহ** পূর্বাকাশে উদিত হয় ও পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তারা প্রচণ্ড গতিতে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। **সৌরাকাশের প্রতিটি বস্তুই যদি পুর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে তবে পৃথিবী কেন পশ্চিম হতে পুর্ব দিকে ঘুরবে? পৃথিবীরও একই দিকে ঘোরা উচিত ছিল**। পৃথিবীর বেলায় নিয়মের ব্যাতিক্রম কেন? কোন কিছুর ব্যাতিক্রম করতে গেলেই এরূপ গরমিলের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীকে ঘোরাতে গিয়ে এরূপ গরমিল সৃষ্টি হবার ফলেই এর গতি উলটো হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, গণিতশাস্ত্র মতে দেখা যায় যে, গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য সবাইকে যদি পৃথিবীর চতুর্দিক ঘুরতে হতো তাহলে চব্বিশ

ঘণ্টায় ঘুরে আসা অসম্ভব। বেশ কথা। পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে যে কক্ষপথে ঘুরে আসতে হয় তার দূরত্ব প্রায় ৬০ কোটি মাইল। পৃথিবী তার অক্ষের চতুর্দিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে ও দিবা-রাত্রি হয়। একবার ঘুরে আসতে তাকে ২৫,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। তাহলে সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করতে তাকে ৬০ কোটি ÷ ২৫ হাজার = ২৪,০০০ বার ঘুরতে হয়। অর্থাৎ ২৪ হাজার বার দিন-রাত্রি হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সূর্যের চতুর্দিক ঘুরে আসতে মাত্র ৩৬৫ দিন সময় লাগে। যে গণিতের সাহায্যে দেখা গেল যে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতে পৃথিবীকে ২৪ হাজার বার নিজ অক্ষের উপর পাক খেতে হয় অর্থাৎ ২৪ হাজার বার দিন-রাত্রি হয় সেই গণিতের সাহায্যেই দেখা যায় যে সম্পূর্ণ কক্ষের উপর ঘুরে আসতে এর মাত্র ৩৬৫ দিন সময় লাগে। চিন্তাশীলরা বের করবেন কি এ শুভঙ্করের ফাঁক কোথায় ? এ অসম্ভবটা কি করে সম্ভব হলো ? বিজ্ঞানীরা জবাব দেবেন কি ?

এবারে সম্ভব এবং অসম্ভবের প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করছি। গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য তাদের কক্ষপথে কিভাবে ঘুরছে সে কথা ছেড়েই দিলাম। আমরা মানুষ, আমাদের সৃষ্টি কি করে সম্ভব হয়েছে সে চিন্তাটা একবার করলেই ভূত ছেড়ে যায়। একবিন্দু জল হতে কি করে এমন সুন্দর আকৃতির মানুষ তৈরী হলো। এ বিশ্বে জলের অভাব নেই। একবিন্দু কেন পাঁচটি বৃহত্তম সাগরের জল একত্রিত করলেও মানুষের একটা ক্ষুদ্রতম কণা পর্যন্ত সৃষ্টি করা কারুরই সম্ভব নয়। সব বৈজ্ঞানিকের কাছেই এটা অসম্ভব বলেই চিরদিন থাকবে। তবু এ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি ?

একই ভাত-মাছ, তরি-তরকারী খেয়ে পুরুষ ও নারী জীবন ধারণ করে। অথচ তারই সারাংশে নারীর বুকে জমা হয় সুপেয়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর দুগ্ধ যার রং উক্ত খাদ্যদ্রব্য হতে সম্পূর্ণই

পৃথক। পুরুষের বুকে এ দুধ সঞ্চিত হয় না অথচ নারীর বুকে কি করে সম্ভব হলো? রক্তের সারাংশ দুধ। এর পরবর্তী অবস্থাই দুর্গন্ধযুক্ত মল। কয়েক মণ রক্ত ও মল একত্রিত করে হাজার বছর সাধনা করেও কি বৈজ্ঞানিকেরা একবিন্দু সাদা দুধ তৈরী করতে পারবে? এ দুধের সৃষ্টি কি অসম্ভব নয়?

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতির আকৃতি, কার্যপদ্ধতি, গতিবেগ সমান নয় অথচ কিভাবে তারা আকাশের কোলে বিরামহীন অবস্থায় কাজ করে চলেছে। কোন দিন কোন সংঘাতের সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে যায়নি। এ নিয়ম পদ্ধতি কি অসম্ভব নয়? যদি এসব অসম্ভব সম্ভব হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয় তবে অসম্ভব বলাটা কি পাগলামী নয়?

যে মহান শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক এসব সৃষ্টি করে আকাশের কোলে সংবিন্যস্ত করেছেন এবং সুন্দর নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করেছেন তাঁর পক্ষে পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্যের মধ্যে তাদের ঘুরানো কিছুই কঠিন নয়, অসম্ভব নয়।

পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, আত্মার সৃষ্টি ও এর সন্নিবেশ, মন ও তার স্থিতি, বুদ্ধি ও বিবেক, জড় ও চেতন প্রভৃতির সৃষ্টি যা আমাদের বোধগম্য নয় তা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবে '**অসম্ভব**' বলে কি আছে? **আমাদের কাছে যা অসম্ভব, সৃষ্টিকর্তার কাছে তাই সম্ভব।**

তৃতীয় প্রমাণে বলা হয়—

"দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়েছে যে অন্যান্য গ্রহগুলোর আবর্তন আছে। পৃথিবী একটি গ্রহ সুতরাং এরও আবর্তন থাকা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।"

যখন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলে না তখনই তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ Logic -এর সাহায্য নেওয়া হয়। এ প্রমাণেও ঠিক তাই করা হয়েছে। সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরবে বলেই যে পৃথিবীকে ঘুরতে হবে এমন কোন কথা হতে পারে না। রেলওয়ে স্টেশনে দণ্ডায়মান গাড়ির উপর

থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের গতিশীল রেলগাড়ি দেখা যেতে পারে—সত্য কথা, কিন্তু তাই বলে কি এটাও সত্য বলতে হবে যে দণ্ডায়মান গাড়িটিও দ্রুতগতিতে চলছে ?

অবশ্য একটা ভুল আমি নিজেও করে থাকি। সেটা অন্য কোথাও নয়। বড় রেলওয়ে জংশনেই এ ভুলটি করি। যখন দুটো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়ানো থাকে তখন আমার বিপরীত দিকের ট্রেনটি চলতে থাকলে আমার কাছে মনে হয় যে আমার ট্রেনটাই চলছে। খুশীতে অনেক সময় স্টেশন মাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়েছি কিন্তু পাশের ট্রেনটা প্লাটফরম থেকে বের হবার পর আমার আক্কেল গুম হয়ে যেত। নিজেকে তখন কালিদাসের মত সেরা নির্বোধ মনে করতাম। আর চুপ করে মুখ ঢেকে বসে থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম জ্যোতির্বিদরা ঠিক আমারই মত ভুল করেছে পৃথিবীকে নিয়ে। গ্রহ-নক্ষত্র সবই ঘুরছে দেখে আত্মহারা হয়ে তারা পৃথিবীকেও ঘুরিয়ে ফেলেছেন। আসলে কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা প্লাটফরমে দাঁড়ানো ট্রেনটারই মত। অন্যান্য গ্রহগুলি ঘোরে। পৃথিবী একটি গ্রহ। তাই পৃথিবীও ঘোরে। সব গ্রহরই একই স্বভাব থাকবে হয়ত এই কল্পনা করেই পৃথিবীর উপর এমন গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিকগণ একথাও বলেছেন যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহেই জীব-জন্তুর অবস্থিতি নেই। তাহলে দেখা যায় যে পৃথিবী গ্রহ হলেও অন্য কোন গ্রহের সহিত সম্পূর্ণ মিল নেই। এক জাতীয় বস্তু ও প্রাণীর মধ্যেই যেখানে স্বভাবের তারতম্য দেখা যায় সেখানে ভিন্ন উপাদান বৈশিষ্ট্য বস্তুর স্বভাব এক হয় কি করে ? পৃথিবী আহ্নিক গতির ফলে যদি ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল বেগে ঘুরত আর বার্ষিক গতির ফলে ঘণ্টায় ৬৮ হাজার মাইল বেগে ঘুরত তাহলে জীবজন্তুর কি অবস্থা হতো ? তাই অন্যান্য গ্রহ ঘুরলেই যে পৃথিবীকেও ঘুরতে হবে এ কল্পনা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।

শূন্যের উপর উঠে কোন যানের মধ্য হতে যে যানের গতি স্থির

দূরবীক্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে দেখলে বোঝা যাবে যে পৃথিবী ঘোরে কিনা। এই পরীক্ষা করে ফলাফল দেখলে বৈজ্ঞানিকগণকে হতাশই হতে হবে। **এছাড়া পৃথিবীর গতি থাকলে এর উপর বসে অন্য বস্তুর গতি কিভাবে নির্ণয় করা যায় একথা কি কেউ ভেবে দেখেছে ?**

চতুর্থ প্রমাণে বলা হয়—

"পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন উচ্চ স্থান হতে কোন ভারী বস্তু নিম্নে ছেড়ে দিলে সোজাসুজি নীচে না পড়ে একটু পূর্ব দিকে সরে পড়ে।"

পীসা, হামবুর্গ, বোলান প্রভৃতি শহরগুলি মানমন্দিরের চুড়া হতে উক্ত পরীক্ষাটি করে দেখা গিয়েছে যে "১,০০০ ফুট উচ্চ স্থান হতে প্রস্তর ছেড়ে দিলে প্রায় ⅓ ইঞ্চি পূর্ব দিকে সরে পড়ে। এতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে।"

এখানে প্রস্তুরটি পড়ার **সময়টুকুর** কথা বলা হয়নি। যাই হোক এক হাজার ফুট উচ্চ হতে কোন জিনিস ফেলে দিলে মাটিতে পড়তে ৮ সেকেন্ড সময় লাগবে।[১] এক মিনিটে পৃথিবী প্রায় ১৯ মাইল পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে সরে যায়। ৮ সেকেন্ডে তাহলে ২½ মাইল পশ্চিম দিকে সরে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেছে যে ২½ মাইলের পরিবর্তে ১ ইঞ্চির ৩ ভাগের এক ভাগ সরে পড়ে। গণিত চর্চার চরম উৎকর্ষের দিনেও যদি ⅓ ইঞ্চিকে ২½ মাইলের সমান বলা হয় ও সবাই মেনে নেয় তাহলে বলতে হবে যে আমার মস্তিষ্কই বিকৃত হয়েছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এখানে যে, উপর থেকে পদার্থটি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা দেখলেন যে তা পূর্ব দিকে সরে পড়েছে। **পূর্ব দিকে সরে পড়ার অর্থ পৃথিবী পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে।**

টীকা—১। $h=\frac{1}{2}gt^2$; Or $1000=\frac{1}{2}32t^2$; $t^2=62{\cdot}85$ $t=8$ sec. (nearly)

গ্যালিলিও প্রমাণ করে বলেছেন, পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে। আর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন যে, পৃথিবী পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘোরে। অঙ্কে যাদের যোগ বিয়োগের জ্ঞান আছে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, একের মধ্যে এক বিয়োগ করলে শূন্য হয় (Result of plus one and minus one is zero)। একই বস্তুর একই সময়ে দুই বিপরীতমুখী গতির অর্থ গতিহীন। অর্থাৎ তাঁরাই প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী পশ্চিম দিকেও ঘোরে না, পূর্ব দিকেও ঘোরে না।

পঞ্চম প্রমাণে বলা হয়—

"কোন দোলক যদি উত্তর দক্ষিণে দুলতে থাকে এবং তার মাথায় Pointer দেওয়া যায় তাহলে বালির উপর দাগ কাটতে থাকবে। ঐ দাগগুলি দেখা যায় যে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে।" উক্ত প্রমাণটি বৈজ্ঞানিক ফুঁকো (Foucault) ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্যারী নগরীতে করেছিলেন।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দোলকটি কি শূন্যের মধ্যে ঝুলানো থাকে না খুঁটির ব্যবস্থা করে ঝুলানো হয়? যদি খুঁটি ছাড়া শূন্যের উপর দোলকটি উত্তর-দক্ষিণে ঝুলতে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন করার কিছু নেই। কেননা এ প্রমাণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ফুঁকো সাহেব এ প্রমাণটি প্যারী নগরীর প্যান্থিয়ান মানমন্দিরের চূড়া হতেই করেছেন—যে মানমন্দিরটি শূন্যে ঝুলানো ছিল না। পৃথিবীর সঙ্গেই আটকানো ছিল।

এখন কি প্রশ্ন করতে পারি যে, তাহলে পৃথিবী ঘুরার প্রমাণ করলেন কিরূপে? মানমন্দিরটি নিয়েই তো পৃথিবী ঘুরছিল। যাকে নিয়ে পৃথিবী ঘোরে না তার সাথেই তো ঝুলানো দণ্ডটি থাকা উচিত। তাই দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক ফুঁকোর প্রমাণেও যথেষ্ট ফাঁক আছে।

ষষ্ঠ প্রমাণে বলা হয়—

"ঋতু পরিবর্তন প্রমাণ করে যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে।"

পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঋতু পরিবর্তনের যে কারণ দেখানো হয়েছে সূর্যকে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরালে ঠিক অনুরূপ পরিবর্তনই দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবী যদি সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতো তাহলে ঋতুচক্রে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হত তাতে জীবজন্তুর কোন অস্তিত্বই থাকত না। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানের দূরত্ব মাত্র এক হাজার মাইল। এইমাত্র এক হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধানে আবহাওয়ার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তাতেই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠেছে। আর ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরলে এক ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা করার সাধ মিটে যেত।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, "পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ বছরে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে উপগোলাকৃতি পথের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। তাই তাপ এবং চাপের পার্থক্যহেতু ঋতু পরিবর্তন ঘটায়।"

খুব সুন্দর যুক্তি। এই যুক্তি কেউ না মেনে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন করছি যে যাঁরা এমন যুক্তি দেখিয়ে পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল ঘুরাচ্ছেন তাঁরা কি জবাব দিতে পারেন যে, ২১শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ধ্রুব নক্ষত্রকে যে স্থানে দেখা যায়, ২১শে মার্চ ও ২১শে সেপ্টেম্বর ধ্রুব নক্ষত্রকে ঠিক সেই স্থানে দেখা যাবে? দূরত্বের ব্যবধান কিন্তু অতি সামান্য নয়, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। বিষুবরেখা হতে উত্তর দিকে ৪ হাজার মাইলের ব্যবধানেই কিন্তু ধ্রুব নক্ষত্র এক ডিগ্রী উপরে দেখা যায়। এ সত্যকে কি তাঁরা কখনও দেখেননি?

কি আশ্চর্য! সূর্যের চতুর্দিকে ৬০ কোটি মাইল পৃথিবীকে ঘুরিয়ে 'ধ্রুব' নক্ষত্রকে একই স্থানে দেখা যাবে এটা কি কোন

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ? ২১শে মার্চ ও ২১শে জুনে পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখা বাড়িয়ে দিলে তা কোন সময়েই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না। কেননা এই দুই সময়ে পৃথিবীকে প্রায় ৯ কোটি মাইলের ব্যবধানে বিপরীত দিকে থাকতে হয়।

নিম্নের প্রমাণ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে সবার কাছে ধরা পড়বে। যে কোন স্থির বস্তুকে লক্ষ্য করে টেলিস্কোপ ফিট করলাম। আবার ডান চক্ষু দিয়ে উক্ত জিনিসটিকে পরিষ্কার দেখলাম। এবার আমি ঠিক থেকে টেলিস্কোপটিকে বাম চক্ষুর কাছে আনলাম। সামান্য দুই ইঞ্চির ব্যবধানে দেখলাম উক্ত স্থির বস্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুই ইঞ্চি টেলিস্কোপটিকে সরালে যদি বস্তুটি অদৃশ্য হয়ে যায় তবে ৯ কোটি মাইল দূরে টেলিস্কোপ সরিয়ে নিলে কি অবস্থা হবে সেটা বৈজ্ঞানিকেরা একবার চিন্তা করে দেখুন। দেখতে পাবেন আপনাদের বার্ষিক গতি কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক।

যাঁরা বেতার বিভাগে চাকরি করেন বা যাঁদের ঘরে রেডিও, ট্রান্‌জিস্টার আছে তাঁরা দেখতে পান যে মাঝে মাঝে বেতার তরঙ্গ (Radio signal) অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্যের কারণ ইংরেজিতে বলা হয় 'Fading'; তাপের ও চাপের তারতম্য হেতু বায়ুস্তরের তারতম্য হয়ে থাকে যার ফলে Radio signal মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। এজন্যই দিন ও রাত্রির Frequency পৃথক। রাত্রে যে Frequency ব্যবহার করা হয় দিনে তা করা হয় না। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন Frequency allotte করা হয়। যদি পৃথিবী ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করত তাহলে প্রতি দু'চার মিনিট পর পরই Frequency পরিবর্তন করতে হতো। নইলে সব সময় Fading লেগেই থাকত, রেডিও আর বাজত না। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী এরূপ প্রচণ্ড গতিতে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে না, অর্থাৎ স্থির। আর স্থির বলেই শুধু রাত্রিতে ও বছরের বিভিন্ন সময়ে তাপ

চাপের পার্থক্যের হেতু বায়ুস্তরের যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলেই Frequency পরিবর্তন করা হয়, পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য নয়।

সপ্তম প্রমাণে বলা হয়—

"নিউটনের সূত্র অনুযায়ী বৃহত্তম বস্তুর চতুর্দিকেই ক্ষুদ্রতম বস্তু ঘোরে। সৌরজগতের সূর্যই বৃহত্তম। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুগুলিই তাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে।"

নিউটনের সূত্রকে অপব্যাখ্যা করেই পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরানো হচ্ছে। কারণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে আয়তনের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে নি। সেখানে বলা হয় যে, দুটো জিনিসের আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে বস্তু দুটির ভর ও দূরত্বের উপর। এক কথায় বলা যায় বস্তু দুটির ওজন। অর্থাৎ কত জোরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এক টুকরো লোহা ও একটা বল সমান জোরে পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাই, আয়তন বেশী হলেই যে ছোট আয়তন বিশিষ্ট পদার্থকে আকৃষ্ট করবে এরূপ কোন কথা নেই (পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী)।

ঠিক আছে, উক্ত সূত্রের উপরই আমরা আলোচনা করে দেখি এর সত্যতা কতটুকু। এর মধ্যে কোন ফাঁক আছে কি না। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য তের লক্ষ গুণ বড় বলে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এদিকে চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে ৫০ গুণ ছোট। এছাড়া পৃথিবীর দূরত্ব হতেও চন্দ্র সূর্যের নিকটতর অথচ চন্দ্রকে কেন তার চতুর্দিকে ঘুরাতে পারে না। এটা আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন্ নিয়ম? পৃথিবীর চেয়ে ৫০ গুণ ছোট ও নিকটতর চন্দ্রকে যদি সূর্য তার চতুর্দিকে ঘুরাতে না পারে তা হলে চন্দ্রের চাইতে ৫০ গুণ বড় ও দূরবর্তী পৃথিবীকে কি করে তার চতুর্দিকে ঘুরায়? নিউটনের যে সূত্রে প্রমাণ করলেন যে ছোট বলে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে, সেই সূত্রে কেন প্রমাণ করলেন না যে চন্দ্রও সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরবে? ধ্রুব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। অথচ কেন সূর্য তার চতুর্দিকে ঘোরে না?

পৃথিবী যদি দুটি গতি নিয়ে (আহ্নিক ও বার্ষিক গতি) সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে তবে চন্দ্র একটা গতি নিয়েই বা কি করে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে? এ প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন জাগে যে রকেট কয়টা গতি নিয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে? আপন মেরুদণ্ডের উপর পাক খেতে খেতে পৃথিবী ঘুরে আসে—না চক্রাকারেই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে? গতিশীল রকেট গতিশীল পৃথিবীর বক্ষে নামেই বা কি করে? একটি গতিশীল পদার্থ অন্য একটি গতিশীল পদার্থের উপর পড়লে সংঘাতে দুটোই ধ্বংস হবার কথা। কিন্তু রকেট ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর বক্ষে পতিত হয়েও ধ্বংস হয় না কেন? পৃথিবীর যে কোন গতি নেই এটাই এর প্রকৃত প্রমাণ।

অষ্টম প্রমাণে বলা হয়—

"সূর্য ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হয়ে ঠিক পশ্চিম দিকে অস্ত যায় না। গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে এবং শীতকালে দক্ষিণ দিকে সরে আসতে দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর বার্ষিক গতি আছে অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে।"

সূর্যের উদয় এবং অস্ত বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সূর্য যে কক্ষপথে ঘুরছে সে কক্ষপথ স্থির নয়—একবার বিষুবরেখার ঠিক সোজা উপরে আসছে আবার আস্তে আস্তে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরে পড়ছে। যার ফলে এক সময় উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট আবার এক সময় দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হচ্ছে।

একটি গ্লোবের চতুর্দিকে একটা বৃত্তাকার রিং-এর উপর যদি একটি বাল্ব ফিট করানো যায় এবং রিংটি গ্লোবের চতুর্দিকে ঘুরানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে গ্লোবের এক পাশে আলো পড়েছে আর বিপরীত পাশে অন্ধকার হচ্ছে। আলোর পাশটা দিন আর অন্ধকারের পাশটা রাত। এবারে রিংটাকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিলে দেখা যাবে দক্ষিণাংশে আলো পড়েছে

কিন্তু উত্তরাংশে আলো পড়ছে না। আবার উত্তর দিকে সরিয়ে নিলে দেখা যাবে এর বিপরীত। তাহলে দেখা যাবে যে গ্লোবটিকে না ঘুরিয়ে বিভিন্ন সময়ে উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে কিরণের তারতম্য হয়ে থাকে। তদ্রূপ সূর্যকিরণের উপরই ঋতু পরিবর্তন নির্ভর করে। ভৌগোলিক প্রমাণে ঋতু পরিবর্তন পরিচ্ছেদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বইটির উক্ত পরিচ্ছেদ দেখুন।

[বিছমিল্লাহ]

প্রশ্নোত্তর

বইটি প্রকাশ করার পর স্কুল-কলেজ থেকে যথেষ্ট আমন্ত্রণ পাচ্ছি এবং সৌভাগ্যও হয়েছে অনেক স্থলে ছাত্র-শিক্ষক এবং জ্ঞানীদের সমাবেশে বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে। তাঁদের বিপুল আনন্দ, উদ্দীপনা ও সহানুভূতি দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি। যে প্রশ্ন কয়েক শতাব্দী হতে জটিল রূপ ধারণ করেছে এবং যে বিশ্বাস মনের কোণে শিকড় গেড়ে বসেছে তার সমাধান অল্প কথায় হয় না। আমার পুস্তকেও সব প্রশ্নের সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি। অগণিত প্রশ্ন রয়েছে এবং থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবী ঘোরে এ কথা ৩ শত বছর থেকে শুনে আসলেও, যুক্তি এবং প্রমাণ মিললেও মনে যে সব প্রশ্ন জাগে তার সমাধান কেউ করতে পারেনি। শৈশবে শিক্ষকমণ্ডলী যখন প্রথম এই বিশ্বাস আনবার চেষ্টা করতেন তখন একটা ছাত্র-ছাত্রীও মন দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি যে পৃথিবী ঘোরে। বাধ্য-বাধকতার মাধ্যমে এবং পরীক্ষায় নম্বর না পাওয়ার ভয়ে প্রতিটি ছাত্র এবং উত্তরকালের বৈজ্ঞানিক পর্যন্তও মেনে নিয়েছেন। কালচক্রে এ প্রশ্নের উপর চিন্তা করার অবকাশ আর হয়নি। আর হয়নি বলেই মনের কোণে অনেক প্রশ্ন আজও জাগে। ঠিক সেইরূপ গোলক ধাঁধায় পড়ে আমার নতুন কথাকে বিশ্বাস করতেও

আবার সবার মনেই বহু শতাব্দী ধরে ঐরূপ প্রশ্ন জাগবে। তাই যখন ভাই-বোনদের তরফ থেকে জটিল প্রশ্ন আমার উপর আসে তখন অত্যন্ত খুশী হয়েই জবাব দিতে চেষ্টা করি। বইটি প্রকাশ করবার সময় আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলোচনা আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত লিখিতভাবে কোন বিরূপ সমালোচনা পাইনি। যাঁরা আমার মতে বিশ্বাসী নন তাঁরা দূর থেকে অনেক কিছু বললেও লিখিতভাবে কিছু বলেননি। তবে স্কুল-কলেজের ভাই বোনেরা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী যে সব প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন সেগুলোর মধ্য হতে কিছু কিছু তুলে ধরলাম এবং এতদ্‌সঙ্গে আমার দেওয়া উত্তরগুলোও পেশ করলাম।

প্রশ্ন : চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে কোন পদার্থকে উপর দিকে ছুঁড়লে যদি তা আবার হাতের মধ্যে ফিরে আসে তবে উড়োজাহাজ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরবে না কেন?

উত্তর : চলন্ত ট্রেনে বসে কোন জিনিস উপর দিকে ছুঁড়লে তা হাতের মধ্যেই পড়বে। কেননা ট্রেনের অভ্যন্তরে যে শূন্যস্থান আছে তাকে ট্রেনের ছাদ দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তাই ট্রেনের সঙ্গেই সে কামরা শূন্যস্থান সহ চলবে। পৃথিবীর উপরে এরূপ কোন ছাদ দিয়ে উপরের শূন্যস্থানকে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়নি যার জন্য শূন্যস্থান পৃথিবীসহ ঘুরবে। এই সুন্দর প্রশ্নটির সমাধান সহজেই মেলে। ট্রেনের ছাদের উপর বসে একটা ঢিল উপর দিকে ছুঁড়লে দেখা যাবে তা আর হাতের মধ্যে ফিরবে না। খোলা রিক্‌সা বা খোলা ট্রাকের মধ্যে বসে যদি উপর দিকে গুলি ছোঁড়া যায় তাহলেও দেখা যায় গুলিটি মাথায় পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও বিবেচনা করার আছে যে পৃথিবী সমতলের উপর চলছে না। চক্রাকারে ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলের বেশী গতিতে ঘুরছে। এছাড়া বার্ষিক গতির ফলে আবার ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে ঘুরছে (বৈজ্ঞানিকদের মতে)। শুধু আহ্নিক গতিই যদি বিবেচনা করি

তবুও দেখা যায় পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৫৩০ গজ দূরে সরে যায়। তাই কোন মতেই উড়োজাহাজ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরতো না যদি পৃথিবীর এরূপ গতিবেগ থাকত। এ প্রমাণেও যদি কারও সন্দেহ জাগে তবে নাগরদোলায় উঠে একটি ঢিল ছুঁড়তে অনুরোধ করি। যদি কেউ হাতের মধ্যে সেই ঢিল আবার ফিরে পান তবে বলব পৃথিবী ঘুরলেও উড়োজাহাজ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরবে।

প্রশ্ন: সব গ্রহই ঘুরছে। পৃথিবী একটি গ্রহ। সুতরাং পৃথিবী ঘুরবে না কেন?

উত্তর: পৃথিবী সূর্য হতে উৎপত্তি হয়েছে। একই সঙ্গে 'ভেগা' নক্ষত্রের সংঘাতে সূর্যের কিছু অংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে পড়েছে। তাই অন্যান্য গ্রহদের মত পৃথিবীও ঘুরবে একথা বিশ্বাস করবার মত যুক্তিই বটে। তবে একই সঙ্গে ছিটকিয়ে পড়া অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে পৃথিবীর গ্রহের কোন মিল নেই। আকৃতি, স্বভাব ও কার্যকারিতার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের ভয়ানক গরমিল। তাই যুক্তিতর্ককে এবং বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণের ভিত্তিতেই বলা চলে না যে পৃথিবী তাদেরই সঙ্গে ছিটকিয়ে পড়া একটা গ্রহ। কেননা পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে (বৈজ্ঞানিকদের মতে) কিন্তু একই দূরবস্থা সম্পন্ন অনেক গ্রহ পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরে পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পৃথিবী দুটো গতি নিয়ে একবার উত্তর-দক্ষিণে (বার্ষিক গতির কারণে) আবার পূর্ব-পশ্চিমে (আহ্নিক গতির কারণে) ঘুরে যেমন নাজেহাল অবস্থায় এসে পড়েছে তেমন দূরবস্থা কিন্তু অন্যান্য গ্রহের হয়নি। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধুত্ব মোটেই নেই। অর্থাৎ পৃথিবী একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি (Independant creation)। এই পৃথিবীকে উপলক্ষ করেই যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। যাকে উপলক্ষ করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি তার সেবাতেই অন্যান্য বস্তুর নিয়োজিত থাকা উচিত, পৃথিবীর নয়। তাই কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে—

"তোমাদের জন্যই চন্দ্র সূর্যকে ঘূর্ণনশীল রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।" [সূরা ইব্রাহিম]

"পৃথিবীর আকাশকে তারকাপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে।" ['সূরা সাফফাত' ও সূরা মোল্‌ক]

যাদের দ্বারা এ পৃথিবীকে সুশোভিত করা হয়েছে, যাদেরকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কার্যে নিয়োজিত করা হয়েছে, তাদের পিছনে এ পৃথিবী ঘুরবে এ কল্পনা পাগলামিরই সামিল। কোন সুস্থ মস্তিষ্কই এ কল্পনা করতে পারে না। পৃথিবীর জন্মতত্ত্ব পরিচ্ছেদে আমি বিজ্ঞান ও কোরআনের প্রমাণে প্রমাণ করেছি যে পৃথিবী গ্রহ নয়, সূর্য হতে উৎপত্তি হয়নি। তাই পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে না।

প্রশ্ন : ফেরেল-এর সূত্রে বলা হয় যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই বিষুবরেখার দিকে আগত বায়ু উত্তর হতে সোজা দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হতে সোজা উত্তর দিকে না গিয়ে উত্তর-পূর্ব হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। এ থেকে কি পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রমাণ হয় না ?

উত্তর : ফেরেল সাহেবের এ সূত্র কোন বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই মেনে নিতে রাজী নন। যাঁরা প্রমাণ করেননি, বায়ুমণ্ডলের গতি নিরীক্ষণ করেননি এবং যাঁরা শুধু পরের উপর নির্ভরশীল, তাঁরাই ফেরেল সাহেবের এ অবাস্তব প্রমাণকে আমল দিয়েছেন। যদি বিষুবরেখার দিকে আগত বায়ু বছরের সব সময় কোণাকোণি মুখে প্রবাহিত হতো তবে উত্তরের শহরগুলো হতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণের শহরগুলো হতে উত্তরে যেতে উড়ো-জাহাজকে বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে কোণাকোণি যেতে হতো নতুবা নির্দিষ্ট স্হানে পৌছানো সম্ভব হতো না। উড়োজাহাজের চালককে জিজ্ঞাসা করলে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে যে মস্কো হতে কায়রো অথবা কায়রো হতে মস্কো যেতে এরূপ কোণাকোণিভাবে বিমান চালনার দরকার হয় কি না।

একই দ্রাঘিমায় অবস্হিত দুই স্হানের বায়ুমণ্ডলের গতি ভিন্নরূপ। যেমন দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত-মালাদ্বয় একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তথা পূর্বঘাট অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে ঐ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম হতে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়। এরূপ অন্যান্য স্থানেও একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত থাকলেও বায়ুপ্রবাহ ভিন্নরূপ। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, ফেরেল সাহেবের সূত্র ভিত্তিহীন এবং পৃথিবী স্থির।

প্রশ্ন : পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকলে কিরূপে দিবা-রাত্রি হয় ?

উত্তর : সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরলে যেমন দিবা-রাত্রি হয় তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরলেও ঠিক তদ্রূপই দিবা-রাত্রি হবে। একটি গ্লোবের চতুর্দিকে একটি আলো নিয়ে ঘুরালে দেখা যাবে যে একপাশে অন্ধকার হচ্ছে আর একপাশে আলো পড়ছে। আলোর দিকটা দিন আর অন্ধকারের দিকটা রাত্রি।

পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে বৈজ্ঞানিকরা দেখতে পেলেন যে পৃথিবীর একপাশেই শুধু আলো পড়ছে, অন্য পাশটা চির অন্ধকার থাকছে। এই সমস্যার কোন সমাধান হয় না দেখে পৃথিবীর উপর আর একটা গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো। পৃথিবীকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে শুধু বোকার মত সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরলেই হবে না, আপন কক্ষের উপর ডিগবাজী খেয়ে ঘুরতে হবে। নইলে আমেরিকার লোক চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হবে আর এশিয়াবাসীরা সূর্যের তেজে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি দুটি মহাদেশের অবস্থা এই হয় তাহলে কাদের আর নৃত্যশিল্পী দেখাবে ? এরূপ আদেশ পেয়ে একান্ত অনুগত দাসের মত পৃথিবী ঘুরতে আরম্ভ করল। সেই অবধি এই আহ্নিক গতির খেলা। এই আহ্নিক গতির অস্তিত্ব দেখতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ফুঁকো সাহেবের আক্কেল গুম হয়ে গেল। তিনি কয়েক শত ফুট উপর থেকে একটি পদার্থকে ছেড়ে দিলেন

এবং দেখতে পেলেন যে পদার্থটি ⅓ ইঞ্চি দূরে সরে পড়েছে। অমনি চিৎকার করে উঠলেন এবং বলে ফেললেন যে এই দেখ পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা বললেন, "স্যার একি! এ যে পূর্ব দিকে সরে পড়েছে। পড়বার কথা পশ্চিম দিকে। কেননা পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে।" ফুঁকো স্যার বললেন, "আরে বুঝলে না, যে জায়গা হতে পদার্থটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে একটা পরিধি অঙ্কন করলে তা পৃথিবীর পরিধির চাইতে বেশী হবে যে এ কথা শেখাতে হবে?" শিষ্যেরা বলল, "জি হুজুর"! এবারে বলুন, যদি বাইরের পরিধি পৃথিবীর পরিধির চাইতে বড় হবার জন্য ⅓ ইঞ্চি পূর্ব দিকে সরে পড়ে তবে পৃথিবী ঘুরল কোথায়?

আহ্নিক গতি কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, অবাস্তব। পৃথিবীর কোন আহ্নিক গতি নেই। যদি থাকত তাহলে এর বুক থেকে উপরে উঠে আবার ফিরে আসা অসম্ভব হতো। তাছাড়া আরও মজার ব্যাপার হতো এই যে একটা এরোপ্লেন অথবা হেলিকপ্টার নিয়ে উপরে ২৪ ঘণ্টা স্থির থাকলে পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে দেখা যেত। এছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে পৃথিবী লাটিমের মত পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পৃথিবী যদি ঘুরত তবে ঢাকা হতে করাচী এবং করাচী হতে ঢাকা পেঁছিবার সময়ে অনেক পার্থক্য হতো। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই সে পার্থক্য দেখাতে পারবেন না। দুই-এক মিনিট যে পার্থক্য হয় সেটা পৃথিবী ঘূর্ণনের জন্য নয়।

একটি সাইকেলের চাকাকে যদি তার স্প্যান্ডের উপর ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এবং যে কোন একটি স্হানে লাল চিহ্নিত করে উপর থেকে একটা পদার্থকে এর উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কোন পাগলও বলবে না যে ঐ লাল দাগের উপর পড়বে। পৃথিবীর যদি আহ্নিক গতি থাকত তবে ঐরূপ নির্দিষ্ট স্হানে বিনা কৌশলে পড়বার সম্ভাবনাও তদ্রূপই হতো।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা আমার এই প্রমাণের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের মতে উড়োজাহাজটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যেই থাকে। তাই পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারে বলে যুক্তি দাঁড় করান। যখন জিজ্ঞাসা করা যায় যে বায়ুমণ্ডল যদি পৃথিবীরই অংশ হয়ে থাকে তবে ভূমিকম্পের সময় যখন পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায় তখন এর ধাক্কা শূন্যে অবস্থিত উড়োজাহাজটিতে লাগে না কেন? এর জবাব কেউ দিতে পারেননি। যখন জিজ্ঞাসা করতাম যে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক বেশী না উপরের দিকে বেশী, তখন সবাই একবাক্যে উত্তর দিত যে কেন্দ্রের দিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক বেশী। খুশী হয়ে বলতাম যে যদি তাই হয় তবে কিরূপে বলেন যে উপরের উড়োজাহাজটি—পৃথিবী যে বেগে ঘোরে ঠিক সেই বেগে ঘুরবে? এর উত্তর পাওয়া যায়নি। এছাড়া পৃথিবীর গতির দিকে উড়োজাহাজটিকে যেতে হলে তার গতিবেগ বেশী করতে হবে—না কম করতে হবে এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলেনি। একই গতি নিয়ে উড়োজাহাজটি পৃথিবীর অনুকূলে এবং প্রতিকূলে সমান জায়গা অতিক্রম করে কি করে—না এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও অনেকেই মাথা চুলকায়।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলকে আয়ত্তে রাখতে পারে না, আর হাজার হাজার ফুট উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলকে কিভাবে ঠিক রাখে? পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডলেরও একটা সীমা আছে। প্রথম স্তরকে বলা হয়, Troposphere। এটি পৃথিবীর উপরে ৭ মাইল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় Propopause—৭ থেকে ৮ মাইল। তৃতীয় স্তরকে 'Stratosphere বলা হয়। এটি ৮ থেকে ৫00 মাইল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই স্তরের বায়ু অত্যন্ত লঘু এবং সেখানে বায়ু চলাচল নেই বললেই চলে। এই সীমার উপরে হিলিয়াম, ক্রিপটন ইত্যাদি হাল্কা গ্যাসীয় স্তর বিদ্যমান। সেখানকার চাপও কম এবং

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানও অনেক কম। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছাকাছি টান যত বেশী, উপরের দিকে তার তুলনায় অনেক কম। তাই যারা একথা বিশ্বাস করেই নিজের যুক্তিকে টিকিয়ে রাখতে অহেতুক চেষ্টা করে যে উপরে অবস্থিত উড়োজাহাজটি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে, তাদের জানা উচিত যে সামান্য কয়েক মাইল উপরে উঠলেই পদার্থের ওজন কত কমে যায়। ওজন কমে যাওয়ার অর্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এ প্রমাণ পরীক্ষিত। কোন পদার্থের ওজন যখন কমে যায় অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান কম পড়ে তখন সেই পদার্থটি পৃথিবীর উপরিস্থিত পদার্থের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এ ধারণা শুধু অন্ধ ধারণাই নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রশ্ন ঃ আজ কয়েক শত বছর হতেই এ মতবাদ প্রচলিত যে পৃথিবী ঘুরছে। পৃথিবী যদি স্থির থাকত তবে বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন কি করেছেন ?

উত্তর ঃ যখন কোন মতবাদ প্রচলিত হয়ে যায় তখন সেটাকে উল্টান অত্যন্ত কঠিন। একটা ভুলকে যদি কেউ ভুল বলেও জানে তবু পারিপার্শ্বিক চাপে সে ভুলকে সত্য বলেই মানে। কোরআন অবতীর্ণ হবার পরেও ভুলকে সত্য বলেই ধারণা করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেও মানুষের মন চায়নি। এই মহাসত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে যে কিরূপ নির্যাতন ও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে এ কথা সবাই জানে। পাগল আখ্যা নিয়ে নিজের মাতৃভূমিকে ত্যাগ করতে হয়েছে তবু সত্যকে সত্য বলে বোঝানো যায়নি। কারণ হলো এই যে মানুষ জন্মের পর থেকে বাপ দাদার মুখে যা শুনে আসে সেটাই চিরসত্য বলে অন্তরে স্থান দেয়। যখন তার অন্তরে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে উপড়ে ফেলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাই বলেছেন ঃ "আঠার বছর পর্যন্ত মানুষ যা কিছু শেখে, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সেটাকেই অনুসরণ করে।"

টলেমীর 'পৃথিবীর কেন্দ্রিক' মতবাদ ছিল সর্বজনস্বীকৃত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই এই মতবাদ ছিল সারা বিশ্বে প্রচলিত। কেননা বেদ, বাইবেল এবং কোরআন কোন গ্রন্থেই উল্লেখ নেই যে পৃথিবী ঘোরে। 'চন্দ্র, সূর্য ঘূর্ণনশীল এবং পৃথিবী স্থির এ কথারই উল্লেখ আছে।' গ্যালিলিও-এর মতবাদ কোন শাস্ত্রমতেই গ্রহণীয় ছিল না। এছাড়া বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণের ভিত্তিতেই কোন জ্যোতির্বিদকে বা পদার্থবিদকে এ ধারণা বিশ্বাস করাতে পারেনি। তাই তাকে যখন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় তখন কোন সাহসী পণ্ডিত ব্যক্তি বা বৈজ্ঞানিকই তাঁর যুক্তির সমর্থনে হাকিমের কাছে আর্জি পেশ করেন নি—যার জন্য তিনি হাকিমের সম্মুখে নতজানু হয়ে বলতে বাধ্য হয়ছিলেন—

"সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্র একথাও সত্য নয়। পৃথিবী ঘুরছে তার মেরুদণ্ডের উপর—ঘুরছে সূর্যের চারপাশে এ কথাও সত্য নয়। এসব কথা বলে আমি অপরাধ করেছি।" (১৬৩৩ সনের ২২শে জুন তারিখে)।

জানি না যাঁরা আজ পৃথিবী ঘোরে বলে দাবী করেন তাঁরা গ্যালিলিও-এর বিচারের দিন 'পৃথিবী ঘোরে' এ কথা বলবার সাহস পেতেন কিনা। অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদ কিন্তু তখন ছিলেন যাঁরা এ থিওরী মেনে নিতে পারেননি।

বৈজ্ঞানিকেরা কোন যুগেই বসে নেই। সর্বযুগেই এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গ্যালিলিও-এর পরের বৈজ্ঞানিক নিউটন পৃথিবী ঘোরে এ কথা মেনে নিতে পারেন নি। এর পূর্বে এশিয়া বা ইউরোপের কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিকই বলেননি যে পৃথিবী ঘোরে। ১৯৫২ সালে মাইকেলসন্স ও মর্লি নামে দু জন বৈজ্ঞানিক আলোর গতিবেগ পৃথিবী ঘূর্ণনের দিকে এবং বিপরীত দিকে পাঠিয়ে দেখতে পেলেন একই। তখন তাদের ভ্রম ভাঙ্গলো এবং সারা বিশ্বে প্রচার করে দিলেন যে পৃথিবী ঘোরে না। এ কথা কোন পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকই

না মেনে পারেন নি। তবে বিপরীত সমস্যার সমাধান করতে না পেরে এর উপর আলোচনা বন্ধ থাকে এবং এটা নিয়েই গবেষণা চলে। এই সময়ে মহাবৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে পৃথিবী ঘূর্ণনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যা পাওয়া গিয়েছিল তা এই দাঁড়ায় —"পৃথিবী ঘোরে বস্তুত এর কোন প্রমাণই নেই।" বিশ্ব রহস্যে আইনস্টাইন—তর্জমা এম. এ. জব্বার। [পৃঃ ৪৫—৪৬]

১৯৬৪ সনে প্রফেসর সালামতুল্লাহ ঘোষণা করেন 'পৃথিবী স্থির।' তাঁর মতবাদ দেখতে দেখতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর খ্যাতিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই ঢাকা ইউনিভারসিটিতে একটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ তাঁর মেলে না। পরিশেষে, বেচারা এদেশ থেকে পালিয়ে বিলেতে গেলেন। মুসলমান মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করে তা দেখে আমারও ভয় হয় যে অদূর ভবিষ্যতে আমাকে 'বিলেত' না হলেও 'কালাত' যেতেই হবে।

যুক্তিবাদী মানুষের কাছে মনের কথা পেশ করা যায়। যুক্তির মাধ্যমে তাঁরা ভাল মন্দ, ঠিক-বেঠিক, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ঠিক করে থাকেন। কিন্তু যারা যুক্তিবাদী নয় পরের মুখে ঝাল খেয়ে অভ্যাস তাদের নিয়েই বিপদ। তারা নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না, অন্যের কথাতেও তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। যে শ্রেণীর লোক পৃথিবী স্থির করেন ঠিক সেই শ্রেণীর লোকেই কিন্তু পৃথিবী ঘোরে শুনে গ্যালিলিওকে জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাস্তায় বের করেছিল। আর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁরাই ব্রুনকে হত্যা করেছিল। এই সমাজই 'হ্যানিম্যানকে' দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করেছিল। নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিল। বার্টাণ্ড রাসেলকে বরখাস্ত করেছিল। ইবনে সিনাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তারাই ঈশা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। মুসা (আঃ)-কে যাদুকর বলে বিতাড়িত

করেছিল। হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল আর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে পাথর মেরে দন্ত শহিদ করে দিয়েছিল ও পবিত্র পদদ্বয়কে নির্মমভাবে বিক্ষত করেছিল। কি তারা করেনি? ভুল মতবাদ শত শত বছর ধরে টিকে থাকলেও সেটা ভুল। সেটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কৃতিত্ব নয়। গ্যালিলিও-এর মতবাদ শত শত বছর ধরে টিকে আছে বলেই যে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এর কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা সাধারণ মানুষের অনুভূতি, যুক্তি, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় প্রমাণের বিরুদ্ধেই রচিত এ মতবাদ। তাই কোন পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ ও ধর্মীয় পণ্ডিতই মেনে নিতে পারেননি। যারা পৃথিবী ঘোরে বলে মেনে নিচ্ছেন তারা কিন্তু গ্যালিলিও-এর প্রমাণ ছাড়া নিজেরা একটা প্রমাণ দিয়েও প্রমাণ করতে পারবেন না যে পৃথিবী ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে না এর প্রমাণ শত শত এবং যে কোন লোকই এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে পারে।

প্রশ্নঃ পৃথিবীর বার্ষিক গতি না থাকলে ঋতু পরিবর্তন হয় কিরূপে? সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরলে তো শুধু দিন-রাত্রি হবার কথা।

উত্তর: আমার পুস্তকে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। তবুও এর উপর আরও দু-একটি কথা বলছি। সূর্যের অবস্থান ও তাপের উপরই ঋতু পরিবর্তন নির্ভর করে। সূর্য যখন বিষুবরেখার উত্তরে লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে তখন দক্ষিণ অঞ্চল সূর্যতাপ থেকে অনেকটা বঞ্চিত হয়। কুমেরু অঞ্চলে একেবারেই সূর্যতাপ পড়ে না। তাই সেখানকার রাত্রি বড়। অনুরূপভাবে যখন সূর্য বিষুবরেখার দক্ষিণে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন উত্তরাঞ্চলে এই তাপ অনেক কম পড়ে। কোন কোন জায়গায় যেমন সুমেরু অঞ্চল সূর্য তাপ থেকে সম্পূর্ণই বঞ্চিত হয়। ফলে সেখানে ছয় মাস রাত্রি থাকে। সূর্যের এই কক্ষপথ স্থির নয়। পৃথিবীকে যে

কক্ষপথে ঘুরিয়ে ঋতু পরিবর্তন দেখানো হয়, ঠিক সেইরূপ কক্ষপথে সূর্যের অবস্থান দেখালেই সমস্যাটা দূর হয়।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রমাণ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বেশ একটু ফাঁপরে পড়তে হয়। কারণ পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরাতে গিয়ে দেখা গেল যে 'ধ্রুবের' সাথে তার কোন আত্মীয়তাই থাকে না। তখন তাঁরা এই যুক্তি দিলেন যে পৃথিবী যেদিকেই ঘুরুক না কেন তার অক্ষরেখা বরাবরই ধ্রুবের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকবে। আর এভাবে তাকিয়ে পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষপথের সাথে ৬৬½ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করবে। শুধু তাই না, দক্ষিণ আকাশের স্থির নক্ষত্র 'হেডলির অকটেণ্টকে' ও ধ্রুবের সঙ্গেই এক লাইনে গেঁথে রাখতে হবে।

কাঠ বা মাটি দিয়ে গ্লোব তৈরী করা হয়। এই গ্লোবটিকে ঘুরালে সম্পূর্ণটাই এক সঙ্গে ঘুরবে। এর উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ ঘাড় বাঁকা করে ধ্রুব ও হেডলির অকটেণ্ট-এর সাথে প্রীতি জমাবে আর বাকিটুকু ঘানির বলদের মত ঘুরবে, যাদুবিদ্যা অন্যেরা মানলেও আমি মানতে রাজী নই।

কক্ষপথের উপর ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর অক্ষরেখা তার সাথে কোন আকর্ষণ বলে ৬৬½° কোণ সৃষ্টি করবে? কাল্পনিক কক্ষ-পথের কয়েক স্হানে পৃথিবীকে রেখে তার অক্ষরেখা বাড়িয়ে দিলে দেখা যাবে তার বর্ধিতাংশ খুব কম স্হান থেকেই ধ্রুব ও অকটেণ্টকে ছেদ করবে। প্রমাণ করে দেখলেই এ ভুলের চির অবসান হবে। ভৌগোলিক প্রমাণ অধ্যায়ে দেখুন।

এবারে চলুন রকেট নিয়ে প্রমাণ করি। রকেট যখন পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬,০০০ মাইল হতে ৩০,০০০ মাইল। কিন্তু পৃথিবীর গতি কক্ষপথের উপর ঘণ্টায় প্রায় ৭০ হাজার মাইল। যে রকেটের গতি ২৬ হাজার থেকে ৩০ হাজার মাইল সেই রকেট পৃথিবীর গতিপথের সম্মুখ দিকে ঘুরে আসে কি করে? যদি পৃথিবী স্হির না থাকত তবে পৃথিবীর সঙ্গে রকেটের

সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠত। এছাড়া যদি রকেট পৃথিবীর গতিপথের পেছনে পড়ত তবে ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল বেগের পৃথিবীকে রকেট ঘণ্টায় ৩০ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে কিছুতেই ধরতে পারত না। ঘোরার কল্পনা তখন হতো স্বপ্নের মত।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি থাকলে চাঁদের অবস্থাও ঠিক তাই হতো। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে আর প্রেম নিবেদন চলত না। সবাই বলত ইয়া নফ্‌ছি—ইয়া নফ্‌ছি।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবী না ঘুরলে চন্দ্রে অবতরণ সম্ভব হতো কি ? চন্দ্রে অভিযান করে কি বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেননি যে পৃথিবী ঘোরে ?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমি সত্যি হতবাক হয়ে যাই। কি উত্তর দেব ভেবে পাই না। চন্দ্রে অভিযানের ব্যাপার নিয়ে নয়। পৃথিবী স্থির আছে বা ঘুরছে এ ব্যাপার নিয়েও নয়। শুধু এ কথা চিন্তা করেই হতবাক হই যে—সবাই একথা জানে এবং বিশ্বাস করে যে চাঁদ পৃথিবীর চতুর্দিকেই ঘুরছে। পৃথিবীকে ছেড়ে সে কোনদিনই কোথাও লুকোচুরি খেলতে সরে পড়েনি। পৃথিবী হতে তার দূরত্ব সবসময় ঠিক থাকে। পৃথিবী যদি মহাশূন্যের মাঝখানে সূর্যদেবতাকে কুর্ণিশ করতে করতে তার চতুর্দিকে ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল বেগে চলে তবুও চাঁদ তার আজ্ঞানুবর্তী দাসী হয়েই তার চতুর্দিকে ঘুরবে। আর সূর্য-দেবতাকে লাথি মেরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও চাঁদ মর্মাহত না হয়ে তারই (পৃথিবীর) সেবা করবে। তাদের মধ্যকার যে দূরত্ব সেটার ১ ইঞ্চির কম বেশীও হবে না। পৃথিবী যদি সূর্যের চতুর্দিকের উপবৃত্তাকার পথের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছায় চাঁদও সেখানেই যাবে আর উত্তরের শেষ প্রান্তে গেলেও চাঁদ সেখানেই যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো যে পৃথিবী যদি ঘণ্টায় ৭০ হাজার মাইল বেগে দৌড়ায় তবে চাঁদ সামান্য ২,২৮৫ মাইল গতিবেগ নিয়ে তার

সঙ্গে দৌড়ায় কি করে ? যদি পৃথিবীর গতিপথের সম্মুখে চাঁদ পড়ে তবে তার সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীর পেছনে পড়ে তবে জন্মেও আর তাকে ধরতে পারবে না। চাঁদকে রক্ষা করতে হলে এবং দাসীর সেবা নিতে হলে পৃথিবীর স্থির থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

পৃথিবী ঘুরলেও চাঁদে যাওয়া সম্ভব, আর না ঘুরলে আরও বেশী সম্ভব। পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে চাঁদে যাবার কোনই সম্পর্ক নেই। কেননা যখনই কোন পদার্থ পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে শূন্যে যেতে থাকে তখন পৃথিবীর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকে না। একটি চলন্ত ট্রেনে বসে যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া যায় তাহলে ঐ ঢিলটির ট্রেনের সঙ্গে আর কোনই সম্পর্ক থাকে না। থাকে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর। তাই ঢিলটি বস্তুটিকে আঘাত করার পর Rebound করে চলন্ত ট্রেনের পূর্বোক্ত স্থানে ফিরে আসতে পারে না। কেননা এর মধ্যে ট্রেনটি অনেক দূরে যাবে। পৃথিবী যদি স্থির না থাকত তবে চাঁদ থেকে ফিরলেও ঐরূপ অবস্থাই হতো।

যদি পৃথিবী ঘুরত তবে চাঁদে যাওয়া সম্ভব হতো কিন্তু চাঁদ থেকে ফিরে আসার পথে বেশ অন্তরায় সৃষ্টি হতো। পৃথিবীকে Reference ধরেই চাঁদের দূরত্ব ঠিক করা হয়েছে। তাই চাঁদে যাওয়া এবং আসার পথে সময়ের এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পথে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। যারা বলে পৃথিবী ঘোরে এই Calculation-এর উপরই চাঁদের দূরত্ব ঠিক করা হয়েছে তাদের অনুরোধ করি সেই অঙ্কটি আমাকে দেখাতে। যে যুগে পৃথিবী ঘুরত না সেই যুগের বৈজ্ঞানিকদের অঙ্কের মাধ্যমেই চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে এবং সেই দূরত্বকে মেনে নিয়েই চন্দ্রে অভিযান করা হয়েছে।

চাঁদ হতে ফিরে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে যে থিওরি শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছিল সেটাও ভ্রমাত্মক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আজ তারা

একথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে চাঁদের জন্ম পৃথিবী হতে হয়নি। বৈজ্ঞানিকদের চাঁদে অবতরণের বহু পূর্বেই 'বিজ্ঞান না কোরআন' পুস্তকে লিখেছি যে চাঁদের সাথে পৃথিবীর কোনই সামঞ্জস্য নেই। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী সবই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। একথাও বৈজ্ঞানিকরা আজ বলছেন যে, পুরাতন থিওরি হয়ত সবই বদলে যাবে, সূর্য হতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে তাই পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে এ বিশ্বাস আজও আছে। আমি পৃথিবীর জন্মতত্ত্ব পরিচ্ছেদে বিজ্ঞান ও কোরআনের প্রমাণে প্রমাণ করেছি যে পৃথিবীর জন্ম সূর্য হতে হয়নি। কারণ পৃথিবী সৃষ্টির পর চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ আমার একথা কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। যেদিন লিখেছিলাম যে চাঁদ স্বতন্ত্র সৃষ্টি, পৃথিবী হতে সৃষ্টি হয়নি, সেদিন কেউ কথাটার গুরুত্ব দিতে পারেনি। কিন্তু চাঁদ হতে ফিরে যেদিন আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করলেন যে পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম হয়নি, সেদিন প্রমাণের অপেক্ষা না করেই দ্বিধা-হীনচিত্তে সবাই একথা স্বীকার করেছে। খুব বেশী দিন হয়তো আর নেই যেদিন বৈজ্ঞানিকগণ আবার বলতে বাধ্য হবেন যে পৃথিবীও সূর্য থেকে জন্মলাভ করেনি। তাই সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরার থিওরিটা একেবারে ভ্রান্ত। একজন অপরিচিত সামান্য বাঙালি চিন্তাবিদের কথাটা ব্যর্থ যাবে না। প্রমাণ স্বরূপ একখানি বই ঘরে রেখে দিন। দয়া করে নষ্ট করবেন না।[১]

টীকা—১। কথাগুলো লেখার ১০ বছর পরই এটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। জার্মান বৈজ্ঞানিক, ধর্মযাজক, সৈনিক ও গণক **নিকোলাস কপার্নিকাস** প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী স্থির। সমস্ত সৌরমণ্ডল তাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে।

প্রদক্ষিণ সময় (তাঁর মতে) :

শনি	৩০ বছর পর	১ বার	পৃথিবীর	চতুর্দিকে	ঘোরে
বৃহস্পতি	১২ "	"	"	"	"
বুধ	৮০ "	"	"	"	"

(৯ই আগস্ট / ১৯৭৬ সনে বিবিসি রেডিও হতে একথা বলা হয়।)

প্রশ্ন : যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রাশিয়া যে সমস্ত উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করবে সে সমস্ত উপগ্রহ পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরবে। যদি পৃথিবী স্থির থাকত তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি সম্ভব হবে ?

উত্তর : মহাশূন্যে অবস্থিত উপগ্রহ (Satellite) স্টেশনের মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রাশিয়া নিয়েছে। ইতিপূর্বে [Intel-satellite—I (Early bird] আটলান্টিক মহাসাগর এবং দ্বিতীয় উপগ্রহ (Intel-satellite—II) প্রশান্ত মহাসাগরের উপর অভিযান চালিয়েছে। তৃতীয় উপগ্রহ (Intel-satellite—III) গ্রীনিচের ৬২ ডিগ্রী পূর্ব অক্ষাংশে ২২,৩০০ মাইল উপর থেকে ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থান করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে বলে পরিকল্পনা নিয়েছে[১] এবং তদানুযায়ী চট্টগ্রামে ইতিমধ্যেই উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও সুখের কথা। ঘরে বসে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সঙ্গে ডায়াল করে কথা বলছি এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে ?

উপগ্রহগুলো কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করে এ সম্বন্ধে সবারই কিছু ধারণা থাকা উচিত। H. F. Communication System-এ আমরা দেখেছি যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে Radio Signal ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়ে শূন্যের প্রথম স্তর অথবা দ্বিতীয় স্তর

এই কয়েকদিন আগে তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মুলার, স্মুট, গ্রেনস্টোন বলেছেন—**'ব্রহ্মাণ্ড স্থির'** এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ইউ-২ বিমান হতে পর্যবেক্ষণ দ্বারা।

[দৈনিক ইত্তেফাক। ঢাকা, সোমবার, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং]

টীকা—১। চট্টগ্রাম ও ঢাকার তালিবাবাদ হতে ইতিমধ্যে উপগ্রহের মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

অথবা তৃতীয় স্তর হতে প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পুনরায় ফিরে আসে। যে স্থানে এই Radio Signal পতিত হয় সে স্থানে একটা Radio Station স্থাপন করা হয়। Hope Distance-এর উপর নির্ভর করেই এই যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপিত কোন উপগ্রহ কেন্দ্র হতে যদি এই পদ্ধতিতে Radio Signal শূন্যের যে কোন স্তর থেকে প্রতিফলিত করে আনা যায় তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়। এর জন্য আমরা দু-প্রকার উপগ্রহ ব্যবহার করতে পারি। একটি Active Satellite, অন্যটি Passive Satellite.

(1) Active Satellite : ভূ-পৃষ্ঠ হতে ২২,৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে এই উপগ্রহ Radio Relay Repeater হিসাবে কাজ করবে। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ হতে যে Signal Receive করবে তা Amplify করে আবার ভূ-পৃষ্ঠেই ফিরিয়ে দেবে। এই উপগ্রহটি ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে।

(2) Passive Satellite : এই উপগ্রহটিও ভূ-পৃষ্ঠ হতে আগত Signal প্রতিফলিত করে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দেবে। ভূ-পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে চন্দ্র ছাড়া এরূপ প্রাকৃতিক কোন উপগ্রহ কাছা-কাছি নেই। যদি চন্দ্রকে Reflecting Media ধরা হয় তাহলে দেখা যায় যে Signal ঊর্ধ্বদিকে উঠে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসতে ২.৫ সেকেন্ড সময় লাগে। কিন্তু আমাদের নির্ধারিত সময় মাত্র ৪০০ মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ $\frac{৪০০}{১০০০}$ সেকেন্ড। দ্বিতীয়ত, ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে বিরাট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার দরকার যা Radio Signal-কে চন্দ্রপৃষ্ঠ হতে Reflect করে ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া Week Reflected Signal-কে Amplify করে Audible করা বিশেষ এক সমস্যা। তাই এই Passive Satellite-কে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন করা হয়নি।

দূর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে Active Satellite-কেই ব্যবহার করা হয়। এই Satellite-গুলো Synchronised. এগুলোকে Geo-stationary Satellite বলা হয়। অনেকেই মনে করেন যে পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০৪১$\frac{১}{৩}$ মাইল গতিবেগ নিয়ে এই Satellite-গুলো পৃথিবীর চতুর্দিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরতে থাকে। তাই পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থান হতে এই উপগ্রহগুলোর আপেক্ষিক দূরত্ব (Relative distance) ঠিক থাকে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। উপগ্রহগুলো ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপর Circular অথবা Eliptical way-তে ঘুরতে থাকবে, পৃথিবীর চতুর্দিকে নয়। এ জন্যই একে Geo-stationary বলা হয়। যদি ঘণ্টায় ১০৪১$\frac{১}{৩}$ মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘুরে আপেক্ষিক দূরত্ব ঠিক রাখত তাহলে কোন জায়গায় Bombing করতে হলে Jet বিমানের একই পন্থা অবলম্বন করতে হতো। কিন্তু Jet বিমানগুলো Synchronised করে Bombing করার জন্য শূন্যে এরূপ অবস্থায় রাখা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে যে জার্মানরা যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকেই নির্দিষ্ট শহরের উপরে Bombing করে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেত। পৃথিবী যদি ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলের বেশী গতিবেগ নিয়ে ঘুরত তাহলে কি এরূপ Bombing সম্ভব হতো? Geo-stationary Satellite প্রমাণ করে যে পৃথিবী স্থির।

যাঁরা এতে সন্দেহ করে থাকেন তাঁরা Aeroplane নিয়ে পৃথিবীর গতির পক্ষে এবং বিপক্ষে ঘুরে দূরত্বের ব্যবধান দেখে প্রমাণ করতে পারেন যে পৃথিবী ঘোরে কি না। একটি Jet বিমান বা Aeroplane ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে যদি নির্দিষ্ট কোন স্থানের ঊর্ধ্ব হতে পূর্বদিকে চলতে থাকে তবে দেখা যাবে যে প্রতি মিনিটেই নির্দিষ্ট স্থান হতে এটা কত দূরত্ব অতিক্রম করছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানটি পিছনে ফেলে আসছে। এটা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। খ্রীস্টপূর্ব ১০১০ খ্রীস্টাব্দে যখন কোন বিমান বা রকেট তৈরী হয়নি তখন নমরূদ আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযান করতে শকুনের সাহায্যে উর্ধ্বদিকে উঠে যায়। এ ছবিটি পরিষ্কার দেখতে পাবেন—History of Rocketry & Space Travel by Wernher Von Braun/Frederick Ordway III, page 68 (Diagram).

এটা গাঁজাখুরী কোন গল্প নয়। ঐতিহাসিক কাহিনী। পৃথিবী ছেড়ে আকাশে উঠার পরিকল্পনা বহুদিন পূর্ব হতেই মানুষ করেছে। পৃথিবী দুটি গতি নিয়ে ঘোরে একথা নমরূদ জানলে আল্লাহকে মারা ত দূরের কথা নিজের কবর রচনাতেই থাকত ব্যস্ত। কারণ পৃথিবীর পাগলা গতির সাথে শকুনকে Synchronise করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। শকুন Synchronise-এর কথা মানতও না বুঝতও না। তারা শুধু বুঝত কিভাবে শূন্যে রক্ষিত মাংসগুলো ধরা যায়। তাই শূন্যের দিকেই ছিল তাদের গতি। তীরবিদ্ধ করে আল্লাহকে জখম করার পর রাজপ্রাসাদে ফিরে আসার যে বুদ্ধি নমরূদ করেছিল তার মধ্যেও Synchronising কোন পন্থা ছিল না। শুধু মাংসপিণ্ডগুলো শকুনের মস্তকোপরি না ঝুলিয়ে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তাই নির্বিঘ্নে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। Synchronising-এর ধুয়া তুলে যারা পৃথিবীকে ঘুরিয়ে থাকেন তাঁরা নমরূদের এবং সোলায়মান (আঃ)-এর ভ্রমণ কাহিনী একবার পড়ে দেখুন। এরপর পরীক্ষার নিমিত্ত Synchronise না করে Aeroplane-এ ঘুরে দেখুন যে পৃথিবী স্থির না অস্থির।

প্রশ্ন : কোরআনে নাকি বলা আছে যে মানুষ পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু চাঁদে গেল কিরূপে ?

উত্তর : অনেক বন্ধু-বান্ধবই এ প্রশ্নটি আমাকে করেন। অনেকে যারা কোরআন পাঠ করেন তাঁরা সূরা রহমানের নাম ধরে বলে

থাকেন যে সেখানে তো বলা আছে যে মানুষ এবং জিনপরী কখনই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রে পেঁছাতে পারবে না। কোন বিধর্মীর মুখ থেকে কথাটি শুনলে আমি অবশ্য এতটুকু দুঃখিত হতাম না। কেননা তারা কোরআন পড়ে না। হয়তো কোন মুসলমানের কাছে শুনেছে, তাই বলে। কিন্তু মুসলমান হয়ে কোরআনে 'নাকি বলা আছে' একথা বলা অত্যন্ত অন্যায় বলেই আমি মনে করি। আর এই ভিত্তিহীন শোনা কথার উপরই আবার বিশ্বাস করে কোরআনের বাণী না দেখে বিরূপ মন্তব্য করা শুধু পাপই নয় নাস্তিকতা। ইচ্ছামাফিক কোরআনের ব্যাখ্যা করা চলে না। ইচ্ছামত কোরআনের বাণীর সঙ্গে কিছু জোড়া দেওয়া বা বাদ দেওয়াও চলে না। তাই প্রকৃত বাণীই বলা উচিত এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়াই মুসলমানের কর্তব্য।

এবারে শুনুন সূরা রহমানে কি বলা আছে—"ইয়া মাশারাল জিন্নে ওয়াল ইনছে। আনেসতাতাতুম আন্‌তান ফুজু মেন্ আখ্‌তারে সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। ফানফুজু লা তানফুজুনা ইল্লা বে সুলতান। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।"

[দ্বিতীয় রূকু, আয়াত ৩৩]

অর্থঃ "হে মানুষ এবং জিন সম্প্রদায়! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও তবে অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা ঐ আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

সৃষ্টির সেরা জাতি মানুষ এবং জিনকে সম্বোধন করেই আল্লাহ পাক বলছেন যে যদি তোমাদের সাধ্য থাকে তবে আমার এ সৃষ্টির গণ্ডী ছেড়ে অন্য কোথাও তোমরা তোমাদের আধিপত্য বিস্তার কর এবং নিজেদের বৈজ্ঞানিক কৌশলের বিকাশ সাধন কর। কিন্তু তোমরা সে আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না—তাই জোর করে বলেছেন "লা তানফুজুনা ইল্লা বে সুলতান।"

আকাশ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সব কিছুরই

মালিক আল্লাহ একথা কোরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমেই তিনি ঘোষণা করেছেন। যেমন সূরা বাকারায়—"লিল্লাহে মা ফি সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদ।"

আল্লাহকে যখন আকাশ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় বস্তুর মালিক বলে স্বীকার করে নিচ্ছি সেখানে চাঁদের মালিক আল্লাহ নন একথা বলা কি মূর্খতা নয়? চাঁদ কি আকাশ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নয়? চাঁদ কি তাঁর গণ্ডীর বাইরে? আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র অগণিত পদার্থই বিদ্যমান আছে। আল্লাহর সৃষ্ট গণ্ডীর বাইরে আর কোন জায়গা নেই। তাই তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, আমার গণ্ডী ছেড়ে বাইরে যে কোন স্থানে পারতো আধিপত্য বিস্তার কর। পরেই বলেছেন, না—না, তা পারবে না।

প্রশ্ন ঃ কোরআনের কোন বাণীতে কি বলা আছে যে পৃথিবী স্থির?

উত্তর ঃ হ্যাঁ বলা আছে। সূরা ফাতের, সূরা নমল, সূরা লোকমান, সূরা রূমে পরিষ্কার বলা আছে। এছাড়া চাঁদ সূর্য সম্বন্ধে যেমন অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে তারা তাদের নিজস্ব কক্ষের উপর ঘুরছে (যা আমি আমার পুস্তকে দেখিয়েছি) এরূপ একটা আয়াতেও বলা হয়নি "ওয়াল আরদা তাজরি"—অর্থাৎ পৃথিবী ঘোরে। যদি সত্যি ঘুরত তবে যে কোন একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই বলতেন। ঘোরে না বলেই বলা হয়েছে—(১) 'আকাশ এবং পৃথিবী অবিচলিত অবস্থায় রহিয়াছে"; (২) "আকাশ এবং পৃথিবী স্বস্ব স্থানে স্থির রহিয়াছে"; (৩) "পাহাড় পর্বতসমূহকে কীলকস্বরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন তাহা তোমাদের লইয়া দুলিতে না পারে।" ইত্যাদি যা আমার পুস্তকে দেখিয়েছি।

এরূপ বাণী পাবার পরেও যারা বলে পৃথিবী স্থির নয়, অস্থির, তাদেরকে অনুরোধ করব পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে

এরূপ একটা মাত্র আয়াত অথবা দুটো মাত্র শব্দ আরদা তাজরি কোরআন থেকে আমাকে দেখাতে। যদি কোন বন্ধু দেখাতে পারেন তবে তাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। আর যদি দেখাতে ব্যর্থ হন তবে কোরআনের উল্টো অর্থ করে অনর্থক কষ্ট করবেন না এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। যারা কোরআনের বাণী অবিশ্বাস করে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন—

"যাহারা আমার আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে তাহাদের আমি শীঘ্রই আগুনে জ্বালাইব। যখনই তাহাদের চামড়া পুড়িয়া যাইবে তখনি উহা বদলাইয়া তাহাদিগকে নূতন চামড়া দিব যেন তাহারা শাস্তির আস্বাদ পায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরমজ্ঞানী।" [সূরা নেসা, আয়াত ৫৬]

এবারে আশা করি, যে কোন জাতির যে কোন বিশ্বাসী মানুষই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং বিপ্লবী চিন্তাধারায় কোরআন, বিজ্ঞান ও ভূগোলের নতুন নতুন প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করবেন যে পৃথিবী স্থির।

একটা ভ্রান্ত মতবাদকে মুছে দেবার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়—প্রতিটি মানুষেরই। আমার কথায় বিরূপ না হয়ে প্রত্যেকেই চিন্তা করতে শিখুন এবং আমার প্রমাণের চাইতে অধিক মূল্যবান প্রমাণ উত্থাপন করে জাতির সম্মুখে তুলে ধরুন।

প্রশ্ন ঃ "ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকে ইন্নাস্ বাহুন"—সূরা ইয়াসিন। এর অর্থ—"এবং সমস্তই নভোমণ্ডলের মধ্যে ঘুরিতেছে।" যদি সমস্তই নভোমণ্ডলের মধ্যে ঘোরে তবে পৃথিবী নভোমণ্ডলের মধ্য থেকে ঘুরবে না কেন?

উত্তর ঃ কোন কিছুর ব্যাখ্যা করতে হলে বা জানতে হলে তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ জানা দরকার। কোন ঘটনার আগের বা পরের কথা না জেনে সেই ঘটনার উপর কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। যদি কোন শিক্ষক বলেন, "সমস্ত ছাত্রই অনুপস্থিত" তবে এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার প্রতিটি স্কুল-কলেজের ছাত্রই

অনুপস্থিত। একটি নির্দিষ্ট স্কুলের ছাত্র প্রসঙ্গেই কথাটা বলা হয়েছে। অন্য কোন স্কুলের প্রসঙ্গে নয়।

ঠিক সেইরূপে উক্ত আয়াতের পূর্বে সূর্য এবং চন্দ্রের ঘূর্ণনের কথায় পরিষ্কার রূপে আল্লাহ পাক বলছেন। শূন্যের মধ্যে অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী এর মধ্যবর্তী স্থানকেই শূন্য ধরা হয়। এই মহাশূন্যের মধ্যে যা কিছু আছে সবই ঘুরছে। একথা সত্য নয়। কেননা কোরআনেই বলা হয়েছে অনেক নক্ষত্র স্থির আছে। কুল্লুন—এর অর্থ সবই না হয়ে উভয়েই হবে অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য আকাশ এবং পৃথিবীকে Reference করেই সবকিছুর অবস্থান ঠিক করা হয়। পৃথিবী শূন্যের মধ্যে অবস্থান করছে বলেই যে ঘুরছে—এই ধাঁধায় পড়বে মনে করেই আল্লাহ পাক অন্যান্য সুরাতে পৃথিবী ও আকাশকে একটি মাত্র আয়াতের মধ্যে দেখিয়েছেন যে তারা অবিচলিত অর্থাৎ স্থির।

(এছাড়া "ওয়াকুল্লুন কি ফালাকে ইয়াছবাহুন"—এর প্রকৃত অর্থ 'মহাশূন্যের মধ্যে সবই আল্লাহর জয়গানে মত্ত।')

তাছবীহ শব্দ হতে ইয়াছবাহুন শব্দটির উৎপত্তি। তাছবীহ অর্থ—মহিমা প্রচার করা বা জয়গান করা। কুল্লুন—এর বহুবচন অর্থ ধরলে এটাই হবে ঘূর্ণন নয়।

প্রশ্ন: বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকে আপনি মিথ্যা বলেন কিরূপে? এটা কি আপনার গোঁড়ামি নয়?

উত্তর: বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য কোন্‌টি আমি জানি না। কেননা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষিত মিথ্যা বলে যুগে যুগেই প্রমাণ করেছেন। আবার তাঁরাই পরীক্ষিত মিথ্যাকেও সত্য বলে ধারণা করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের চাপে পড়ে সত্য মিথ্যা চক্রাকারে উলট্‌ পালট্‌ হচ্ছে। প্রকৃত সত্য আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত। সত্যের ন্যায়দণ্ডে আমাদের সূক্ষ্মতম জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। তাই সত্যকে বুঝতে গিয়েও মিথ্যাকে আকড়ে ধরি, আবার মিথ্যাকে প্রমাণ করতে সত্যের পথ থেকে সরে পড়ি।

কোন্‌টাকে সত্য বলবো ? পদার্থের বিশ্লেষণ করে জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানী Molicular থিওরীতে বললেন যে, পদার্থকে সর্বশক্তি ও সর্বকৌশলে ভাঙবার পর যখন আর কোন বৃদ্ধি থাকে না তখন যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণাটি পাওয়া যায় তাকে বলে অণু। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন ডাল্‌টন প্রমাণ করলেন যে, অণুই ক্ষুদ্রতম কণা নয়। পদার্থের সর্বশেষ বিভাজ্যের পরিণতি—'পরমাণু'। এদের সমবায়েই এক একটি অণু গঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক Thomson, Rutherford প্রমুখ বৈজ্ঞানিক জন ডাল্‌টনের এই মতবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে সর্বশেষ অংশটুকুকে Electron ও Froton নামে আখ্যায়িত করলেন। কোন্‌টি মিথ্যা এবং কোন্‌টি সত্য উত্তর দিয়ে আমাকে বোঝান ?

বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের পরীক্ষাগার হতে প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই জড়জগৎ মোট ৯১টি Elements দ্বারা গঠিত। আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন কেমিস্ট্রিতে দেখেছি মোট ৯২টি উপাদান আছে। পড়ার মাঝেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সাহেবদের মুখে শুনলাম আরও কতকগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে। তাতে সব মিলে মোট ১০৪টি। প্রায় তিন যুগেরও আগে কলেজ হতে বিদায় নিয়েছি। জানি না এর ফাঁকে আর কয় ডজন Element পরীক্ষাগারে জন্ম নিয়েছে। কোন্‌টিকে সত্য বলে মানব ?

হাজার হাজার বছর ধরে এই ধারণাই ছিল যে পৃথিবী স্থির। কোপারনিকাশ, ব্রুন ও গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বললেন, পৃথিবী স্থির নয় অস্থির। সূর্যের চতুর্দিকে অসম্ভব রকমের দুটি গতি নিয়ে ঘুরছে। সূর্য স্থির এ বিশ্বের কেন্দ্র। মাইকেলসন্স এবং মর্লি, আইনস্টাইন, প্রফেসর সালাম এবং আমার মত আরও অনেকে বললেন, পৃথিবী স্থির। কোন্‌টি গোঁড়ামি ? হাজার হাজার বছরের মতবাদকে অস্বীকার করা গোঁড়ামি ? আল্লাহর বাণী কোরআনকে স্বীকার করা গোঁড়ামি, না বৈজ্ঞানিকদের

পরিবর্তনশীল থিওরীকে অবিশ্বাস করা গোঁড়ামি ? গোঁড়ামি বলতে কোন্‌টা বোঝায় ?

আমার 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' প্রবন্ধটি নিয়ে এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সৌজন্য দেখিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি সত্যি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর নিকট আমি আর একটা নতুন চিন্তাধারা পেয়েছিলাম। এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্য তিনিও করতে পারেননি। আমিও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। তাঁর মতে, পৃথিবীর গতি আছে তিনটি। অর্থাৎ আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ছাড়া আরও একটি গতি আছে। সে গতিটি কি তা অবশ্য তিনি এখনও নির্ণয় করতে পারেননি। একটু হতভম্ব হয়ে বললাম—আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘোরে আর বার্ষিক গতির জন্য উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ঘোরে (বৈজ্ঞানিকদের মতে)। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবইতো শেষ। তৃতীয় গতির জন্য ঘুরতে হলে তো ঊর্ধ্ব এবং অধঃ এই দুই দিকে ঘুরতে হয়। এখন বলুন পৃথিবী স্থির, দুটি গতি নিয়ে ঘোরে, তিনটি গতি নিয়ে ঘোরে, কোন্‌টি বিশ্বাস করা গোঁড়ামি ?

সূর্য স্থির। সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্র একথা গ্যালিলিও বলেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মতে, সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্র নয় স্থিরও নয়। দৈনিক ষোল লক্ষ মাইল বেগে পাগলা ঘোড়ার মত একই দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।

এবার বলুন সূর্য স্থির বলা গোঁড়ামি, না পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াচ্ছে বিশ্বাস করা গোঁড়ামি ? কোন্‌টা ?

বিজ্ঞান কালজয়ী নয়। যুগে যুগেই পরিবর্তনশীল। এছাড়া বৈজ্ঞানিকদের প্রতিটি প্রমাণই যে নিখুঁত সত্য এর কি কোন প্রমাণ আছে ?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা ইউক্লিডের থিওরীকে মেনে এসেছি। ইউক্লিডের মতে, সরলরেখা দ্বারা কোন বস্তুকে সীমাবদ্ধ

করা যায় না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বললেন, ইউক্লিডের ধারণা সত্য নয়। কেননা একটা বৃত্তাকার বস্তুর উপর দিয়ে কোন রেখা টেনে চললে তা একত্রিত হয় অর্থাৎ একই রেখা দ্বারা একটা বস্তুকে সীমাবদ্ধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটা ডিমের যে কোন বিন্দু হতে একটি সরলরেখা টানলে তা ডিমকে সীমাবদ্ধ করে পুনরায় ঐ বিন্দুতে মিলিত হয়। অথচ আমরা দুটি বিন্দুকে কাগজের বা মাটির উপর যোগ করলে তা সরলরেখা রূপেই দেখতে পাই। এখন কোন্‌টি মিথ্যা এবং কোন্‌টি সত্য বুঝব? ইউক্লিডকে মানা গোঁড়ামি না আইনস্টাইনকে মানা গোঁড়ামি?

আলোর গতি ও তার স্বরূপ নির্ণয় করতে নিউটন দিলেন—Corpuscular Theory. এই থিওরীকে সবাই সত্য বলে মেনে নিল। কিন্তু ডাচ্‌ পদার্থবিদ হাইগেন্স Wave Theory দেবার পর নিউটনের থিওরী অকেজো হয়ে গেল। এরপর Maxwell—Electro-magnetic Theory দিলে হাইগেন্সও ডুবে গেলেন। বৈজ্ঞানিক Planck উপরে বর্ণিত কোন থিওরীই মানলেন না। তাঁর Quantum থিওরী সবার উপর জয়যুক্ত হলো। একেও Modify করে আইনস্টাইন দিলেন New Quantum Theory—যা Modern Atomatic Science-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটাই এখন প্রচলিত থিওরী। এরও যে পরিবর্তন হবে না তার কি কোন গ্যারাণ্টি আছে? দেখলেন তো বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যটি কেমন মিথ্যা?

পুরাতনকে মেনে চলাই গোঁড়ামি নয়। গোঁড়ামি সেটাকেই বলে যার পেছনে কোন যুক্তি নেই, কোন প্রমাণ নেই, কোন সত্যতা নেই অথচ বিশ্বাস করা হয়। আগুন, বাতাস, পানি, মাটি, চাঁদ, সূর্য সবই পুরাতন। এই পুরাতনকে বিশ্বাস করা যেমন গোঁড়ামি নয় তেমনি পুরাতন গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করাও গোঁড়ামি নয়। বরং কোরআনকে বিশ্বাস না করে এবং নিজের জ্ঞান বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরের দিকে তাকিয়ে থাকাই গোঁড়ামি।

এ কেনর জবাব কোথায় ?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, দূরবর্তী বস্তুর চাইতে নিকটতম বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ টান বেশী পড়ে। এ মতবাদ প্রমাণের ভিত্তিতেই রচিত। তাই এটি কল্পনা বা অপরীক্ষিত মতবাদ নয়। কিন্তু জ্যোতিষীদের মতবাদ দেখা যায় এর উল্টো। তাঁদের মতে সূর্যের নিকটতম গ্রহদের গতিবেগ দূরবর্তী গ্রহদের গতিবেগের চাইতে কম। তাঁরা দেখিয়েছেন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায়, মঙ্গল ২৪½ ঘণ্টায় স্বীয় অক্ষসমূহের উপর সূর্যের টানে ঘুরছে। আর অতি দূরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনাস যথাক্রমে ১০ ঘণ্টা, ১০¼ ঘণ্টা এবং ৯½ ঘণ্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ঘোরে, অর্থাৎ এদের আহ্নিক গতি পৃথিবী ও মঙ্গলের চাইতেও বেশী। অথচ পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ অন্যান্য গ্রহ হতে সূর্যের নিকটতম। মনে হয় জ্যোতিষীরা সূর্যের প্রখর তেজে ঘূরপাক খেয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেছেন এবং বিভ্রান্তমূলক মন্তব্য করেছেন। বৈজ্ঞানিকরা জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করবেন কি এ কেনর জবাব কোথায় ?

বৈজ্ঞানিকরা এতদিন ধরে প্রচার করেছেন পৃথিবী হতেই চন্দ্রের উৎপত্তি। তাই চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। কিন্তু চন্দ্র অভিযানের পর বিজ্ঞানীরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, "পৃথিবীর যে কোন প্রস্তরের চাইতে চন্দ্র প্রস্তর অধিক প্রাচীন।"[১] চন্দ্রের উৎপত্তি পৃথিবীর জন্মেরও প্রায় ১৫০ কোটি বছর পূর্বে হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, চন্দ্র পৃথিবীর চাইতে ৪৯ গুণ ছোট। অথচ তারই টানে পৃথিবীর বুক দুলে ওঠে এবং সাগরে জলস্ফীতি ঘটে।

এটা মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ উল্টো কথা। এবারে জ্যোতিষীরা বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করেন এ কেনর জবাব কোথায় ?

বিজ্ঞানী এবং জ্যোতিষীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখে কোরআন সত্যি বলেছে—"সত্যের সম্মুখে কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।" [সূরা নজম]

টীকা—১। পূর্বে বর্ণিত। সংগৃহীত 'ইত্তেফাক' ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৭৬ সন, বাংলা।

সমালোচনা

'জাহানে নও' পত্রিকায় 'বিতর্কিকা' পরিচ্ছেদে আমার প্রবন্ধের বিপক্ষে এবং স্বপক্ষে যাঁরা আলোচনা করেছিলেন তাঁদের লেখাগুলো ধারাবাহিকরূপে পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম এবং আমার জবাবও এতদ্সঙ্গে পেশ করলাম। প্রেস হতে অনেক মূল্যবান লেখা নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রকাশিত হয়নি। যদি ইসলামিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তবে ইন্‌শাল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করব।

—লেখক

বিপক্ষে

—জনাব হাবিবুর রহমান ভূঞা

সাপ্তাহিক "জাহানে নও" পত্রিকায় গত ২৩শে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেবের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" বর্ণিত যুক্তিগুলোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। পৃথিবী ঘোরে এবং সূর্য স্থির তা প্রমাণ করা আমার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সব বৈজ্ঞানিক সত্যই কালজয়ী নয়। কয়েক শত বছর পূর্বে পৃথিবী স্থির এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল। ইতালির বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এসে পৃথিবীকে ঘুরিয়ে আর সূর্যকে স্থির করে গেলেন। তারপর থেকেই পৃথিবী ঘুরে আসছে। কেননা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির ফলে যা ঘটে তার অবস্থা এমনি হয়ে থাকে। গত দু-আড়াইশ' বছরের বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর ইতিহাস আমার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে। প্রকৃত সত্য আলেমুল গায়েব আল্লাহতালাই জানেন। আমি শুধু উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত যুক্তিগুলি যে অকাট্য নয় এবং কোন কোন স্থানে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতকগুলি প্রমাণিত সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে তাই নিম্নের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার করে তুলতে চাই।

১। বলা হয়েছে, সূর্য অগ্নিময় ও বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলে তার ওজন পৃথিবীর ওজনের চাইতে কম এবং এজন্যই পৃথিবী ঘুরতে পারে না। এখন কথা হলো বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলেই যে সূর্যের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হবে এটা কোন যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। কারণ সূর্য আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড় এটাই বৈজ্ঞানিক ধারণা। এত বিরাট আয়তনের সূর্য যদি বায়বীয় পদার্থে গঠিত হয় তবু তার ওজন আছে। তাছাড়া সূর্য প্রথম থেকেই বায়বীয় ছিল না। কঠিন ও তরল

পদার্থই বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে। কোন কঠিন পদার্থ বায়ুতে পরিণত হলে তার সামগ্রিক ওজন যে কমে যাবে এটা কেমন কথা। এক সের ওজনের বরফকে বাষ্পে পরিণত করে ওজন করলে তার ওজন এক সেরই হয়।

২। দ্বিতীয় প্রমাণে চুম্বকত্ব শক্তির প্রভাব (Magnetic Theory) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, যদি এই শক্তির প্রভাবেই ঘূর্ণন কার্য সম্পন্ন হয় তবে যেহেতু পৃথিবী একটা বিরাট চুম্বক, কাজেই সূর্যও একটা বিরাট চুম্বক হবে। আর প্রচণ্ড তাপের দরুন সূর্যে চুম্বকত্ব থাকা সম্ভবপর নয়। কাজেই একটা অচুম্বক চুম্বককে ঘোরাতে পারে না।

প্রশ্ন হলো একটি পদার্থ দ্বারা অন্যটি আকৃষ্ট হওয়া এবং অতিরিক্ত দূরত্বের দরুন কাছে টানতে না পারলে ঘূর্ণন সৃষ্টি হওয়ার জন্যে কি চুম্বকত্ব একান্ত জরুরী? মাধ্যাকর্ষণ সূত্র (Law of Gravitation)-ও একথা বলে না। এতে বলা হয়েছে যে, কোন বস্তু অন্য যে কোন বস্তুকে আকর্ষণ করে। একথা যদি সত্য হয় তবে সূর্য চুম্বক না হলেও পৃথিবীকে আকর্ষণ করা এবং এর দ্বারা ঘূর্ণন সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

৩। কোন বস্তু যখন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে তখন তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সবকিছুই দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। দৃষ্টি বহির্ভূত হওয়াটা নির্ভর করে বস্তু দুটোর আপেক্ষিক অবস্থানের উপর। আর দূরত্ব ঠিক রেখেও ঘূর্ণন সম্ভব। যেমন ধরুন, অনেক উপরে কোন একটা স্থির বস্তু আছে। তার ঠিক বরাবর নিচে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটা বিন্দু নিন। এখন এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত কল্পনা করুন। ঐ বৃত্তের পরিধির উপর দিয়ে আপনি যতই ঘুরতে থাকুন না কেন ঐ স্থির বস্তুর দূরত্ব আপনা থেকে সব সময়ই একই থাকবে আর ঘূর্ণনকালে আপনার দৃষ্টি বস্তুটার উপর নিবদ্ধ রাখাও সম্ভব। কাজেই ধ্রুব-নক্ষত্র দৃষ্টির বাইরে চলে

যায় না বলেই পৃথিবীকে যে স্থির হতে হবে এ যুক্তিও অচল। কেননা উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝতে অসুবিধা নেই যে পৃথিবী ও ধ্রুব-নক্ষত্রের অবস্থান এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সবসময় সমান দূরত্ব বজায় রেখে এবং ধ্রুব-নক্ষত্রকে দৃষ্টি সমক্ষে রেখেও পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরতে পারে।

৪। পৃথিবী ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও বেশী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে এবং বায়ুমণ্ডলীরও অনুরূপ বেগে একই দিকে ঘোরা উচিত। আমাদের প্রবন্ধকারের আপত্তি এখানে যে যদি তাই হবে তবে বায়ু অন্যান্য দিকে এমনকি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকেও চলতে পারে কেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে পৃথিবী তার বায়ুমণ্ডলী সমেত যে গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরবে তাতে বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা মানুষ বা অন্য বস্তুর পক্ষে সম্ভব হবার কথা নয়। এখন বায়ুপ্রবাহ হয় কেন? বায়ুপ্রবাহের একটা কারণ আমি উল্লেখ করব। কারণ বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। প্রচণ্ড সূর্যতাপে কোন স্থানের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে সে স্থান ভেকুয়াম (Vacuum) বা বায়ুহীন হয়ে যায়। আর সে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য অন্য স্থানের বায়ু যেদিকে ধাবিত হয় সেদিকে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সে প্রবাহটা যে কোন দিক থেকে হতে পারে। আর এ প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্যে বায়ু যদি এক হাজার মাইল বেগে অতিক্রম করে উল্টো দিকেও ধাবিত হয় তাও হতে পারে। কেননা বায়ুচাপের শক্তি যে কত প্রবল তা আজ সত্য প্রমাণিত।

এখন আসুন এরোপ্লেনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষমতা উপরের স্তরের বায়ু অপেক্ষা নিচের স্তরে অনেক বেশী সত্য। এখন কোন বস্তু যখন বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে তখন তার নিজের উপরেও মাধ্যাকর্ষণ বল পড়ে। কোন বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের তিনটি এবং মাত্র তিনটি অবস্থাই হতে পারে। (ক) ঐ বস্তুকে পৃথিবীর সহিত আটকে রাখার জন্য

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বল। (খ) আটকে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল এবং (গ) প্রয়োজনের তুলনায় কম বল। প্রথম দু অবস্থায় ঐ বস্তু (এরোপ্লেন) পৃথিবীর সহিত একই গতিতে চলতে বাধ্য, কাজেই উপর থেকে নিচে নামলে স্থান পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। আর তৃতীয় অবস্থায় বস্তুটি পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায় বলে সেটা অন্য উপগ্রহ বা নক্ষত্রের আকর্ষণ ক্ষমতার মধ্যে চলে যাবে। তখন এরোপ্লেন নিয়ে ফিরে আসাই হবে অসম্ভব।

পক্ষে

—আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম খান

সাপ্তাহিক "জাহানে নও" পত্রিকায় গত ২৫শে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত মোহাম্মদ নূরল ইসলাম সাহেবের "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" বিতর্কমূলক প্রবন্ধের যুক্তিসমূহের বিপক্ষে গত ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় হাবিবুর রহমান ভূঞা সাহেব যে মতবাদ পেশ করেছেন তাঁর সাথে আমি একমত নই। পৃথিবী যে স্থির সত্যটি প্রমাণ করার জন্যেই আমি সমালোচনা করছি। ইতালির বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন তাতে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকৃত সত্য চাপা পড়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ অসত্যের বিরুদ্ধে কোন বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করেননি বলে আজও সত্যের প্রকাশ ঘটেনি। পুরাতন তথ্যের অনুকরণ করা বা তার শেখানো যুক্তি দ্বারা প্রমাণাদি দর্শন অতি সহজ। কিন্তু নতুনভাবে তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা মানুষকে সত্য উপলব্ধি করানো খুবই কষ্টকর। সত্যই পৃথিবী যে স্থির এবং সূর্য যে তার চতুর্দিকে ঘোরে সেই সম্বন্ধেই আমি আলোচনা করব।

১। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সমবায়ে গঠিত পৃথিবীর ওজন যে খুব বেশী তা সত্য। পক্ষান্তরে ৪ কোটি ডিগ্রী তাপে সূর্যের দেহে যে কোন প্রকার কঠিন বা তরল পদার্থ থাকতে পারে না তাও সত্য। এবং বায়বীয় পদার্থ ছাড়াও সেখানে কিছু থাকতে পারে না। এত বেশী তাপে বায়বীয় পদার্থের মধ্যে কোন জলীয় অংশ বা অনুরূপ কোন পদার্থ থাকতে পারে না। তাই এর ওজন কোন গণনার মধ্যে ধরা যেতে পারে না। এই যুক্তির বিপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বাষ্পে পরিণত করলে তার ওজনের কম-বেশী হয় না, এ কথা সত্য। তবে ১ সের ওজনের বরফকে বাষ্পে পরিণত করে তার ওজন সমান রাখতে হলে বরফের পাত্রের চেয়ে অনেক বড় একটি পাত্রে ঢাকনি দিয়ে আটকে তাপ দিতে হয়। তাহলেই বাষ্পগুলো বড় আকার পাত্রটিতে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে থাকবে এবং ওজন ঠিক একই সমান থাকবে। কিন্তু সূর্যকে তার চেয়ে বহু গুণ বড় ঢাকনি দিয়ে আটকে রাখা হয়নি যা দ্বারা বাষ্পকে আটকে সূর্যের ওজনকে সমান রাখা যায়। কাজেই এত বেশী অগ্নিদগ্ধ বায়বীয় পদার্থে গঠিত সূর্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বড় হলেও পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ওজন বেশী হতে পারে না এবং পৃথিবীকেও সে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারে না।

২। পৃথিবী যে স্থির এর দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে একটি পদার্থকে আকর্ষণ করা এবং খুব বেশী দূরত্বের দরুন কাছে টানতে না পেরে ঘূর্ণন সৃষ্টি করার জন্য চুম্বকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে যদি একে অপরকে আকর্ষণ করে তবে পৃথিবীর আকর্ষণে হাল্কা বায়বীয় পদার্থে গঠিত সূর্যটার ঘূর্ণন সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই অসম্ভব নয়। সূর্যের এত বেশী তাপ যে, কোন চুম্বক-শক্তি সেখানে থাকতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী নিজেই বিরাট একটি চুম্বক, তা কম্পাস বা অন্যান্য যন্ত্র দ্বারা দেখা গেছে। তাই এত

বড় চুম্বকত্ব সম্পন্ন পৃথিবীর পক্ষে চুম্বকত্বহীন সূর্যকে আকর্ষণ করে নিজের চতুর্দিকে ঘুরানো কিছুতেই কষ্টকর ব্যাপার নয়।

৩। ধ্রুব নক্ষত্রের স্থিরতা সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, কোন বস্তু বরাবর নিচে পৃথিবীতে একটি বিন্দু নিয়ে তার চারপাশে একটি কাল্পনিক বৃত্ত নিয়ে বৃহত্তর পরিধির উপর যতই ঘূর্ণন করা যায় স্থির বস্তুটির দূরত্ব সব সময় একই থাকবে। তাতো ঠিক-ই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, পৃথিবী চিরকাল একই স্থানে থেকে নিজের চারপাশে ঘোরে না, যা সবগুলো নক্ষত্রের চারদিকেও ঘোরে না যাতে সবসময় ধ্রুব-নক্ষত্র বা অনুরূপ অন্যান্য নক্ষত্রগুলো পৃথিবীর সমান দূরত্বে থাকবে। বরং পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজেই সূর্য ছাড়া অন্য যে কোন নক্ষত্রের সাথে পৃথিবীর দূরত্ব সমান থাকতে পারে না। সূর্য হতে সমান দূরে থেকেই পৃথিবী একে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু বিচার্য বিষয় এই যে ধ্রুব-নক্ষত্র স্থির এবং চিরদিনই ধ্রুব-নক্ষত্রের সাথে পৃথিবীর দূরত্ব সমান থাকে। কাজেই বোঝা যায় যে ধ্রুব-নক্ষত্র ও পৃথিবী উভয়েই স্থির। সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে সমান দূরত্বে থেকে চতুর্দিকে ঘুরছে। নচেৎ ধ্রুবতারকাটি মাঝে মাঝে পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত।

৪। (ক) পৃথিবী যদি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলসহ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবসময়ই ঘুরতে থাকে (বৈজ্ঞানিকদের মতে) তাহলে দেখা যাবে যে পশ্চিমাবায়ু যখন মাত্র ১০ মাইল বেগে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় তাতো সামান্য গতিতে অনুভূত হবে। কিন্তু যখন পৃথিবীর গতি বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে যখন বায়ু পশ্চিম দিকে দশ মাইল বেগে প্রবাহিত হয় তখন তার গতি ১০১০ মাইল হওয়া উচিত। কারণ পৃথিবীর এক হাজার মাইল গতির বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে উক্ত গতি ছাড়াও ১০ মাইল বেশী বেগে প্রবাহিত হতে হয়। তখন তো প্রলয়ঙ্করী ঝড় হওয়ার কথা। কিন্তু

এর ব্যতিক্রম যখন দেখা যায় তখন বোঝা যায় যে পৃথিবী বায়ুমণ্ডল নিয়ে ঘুরছে না। যেমন বলা যেতে পারে যে, ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে প্রবাহিত নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে একটি নৌকা যদি ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে অগ্রসর হয় তবে নৌকার গতি ১০১০ মাইল হতে হবে এবং এতে নৌকা ও স্রোতের মধ্যে ভীষণ-ভাবে সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে।

(খ) পৃথিবী যদি সত্যই ১০০০ মাইল বেগে পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলসহ পূর্ব দিকে ঘুরতে থাকে তবে ভূমিকম্পের সময় বায়ুমণ্ডলীতে ভাসমান উড়োজাহাজে কম্পনের সৃষ্টি হওয়া উচিত। পৃথিবী কম্পনের প্রতিক্রিয়া যখন উড়োজাহাজের গায়ে লাগে না তখন বোঝা যায় যে বায়ুর গতি ও পৃথিবীর গতি এক নয়। পৃথিবীর গতি যদি এক না হয় তবে ঢাকা নগরীর ঠিক উপরের দিকে একখানা উড়োজাহাজ উঠে একঘণ্টা পর নিচে নেমে আসলে ঢাকায় না এসে ১০০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত লাহোরেই তা পড়া উচিত ছিল, তা যখন হয় না তখন বোঝা যায় যে পৃথিবী স্থির।

(গ) বৈজ্ঞানিকদের মতে, পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল। কাজেই পৃথিবী তার চারিপার্শ্বে একবার ঘুরে আসলে ২৫০০০ মাইল পথ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। এতে ২৪ ঘণ্টা বা একদিন লাগে। কিন্তু দেখা যায় যে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তাহলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ১৩ লক্ষ বার ঘুরতে হয়। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ দিন লাগে। আরো বলা হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল মাইল দূরে অবস্থিত। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ দূর থেকে পৃথিবী তার ১৬ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে কয়েক কোটি বছর দরকার হবে। কিন্তু এ যখন হচ্ছে না, কাজেই পৃথিবী যে সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে তা প্রহসন মাত্র এবং ছেলে ভোলানো রূপকথা বৈ কিছুই নয়।

[বিছমিল্লাহহির রহমানের রহিম]

বিতর্কিকা

পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে

[আলোচনা—লেখক]

গত ৩১শে আগস্ট রবিবার সংখ্যায় সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় 'বির্তাকিকা' পরিচ্ছেদে আমার "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" প্রবন্ধের বিপক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন জনাব হাবিবুর রহমান ভূঞা। আপনার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি দেখে সত্যি আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের মত বিদ্বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতবাদকে আমি সাদরে গ্রহণ করি ও ভবিষ্যৎ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই।

আজ আপনার যুক্তির উপরই আবার আলোচনা করছি। প্রথম প্রমাণে বলেছি যে সূর্য একটা 'অগ্নিপিন্ড'। বায়বীয় পদার্থে গঠিত। সুতরাং এর ওজন পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। আপনি অস্বীকার করেছেন। আগুনের ওজন আছে এ কথা আপনি স্বীকার করবেন কিনা জানি না। তবে আমি অস্বীকার করি। আগুন কি উপাদানে গঠিত এ কথাও কেমেস্ট্রিতে বলা নেই। গ্যাস বাদ দিয়ে শুধু আগুনের যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে যা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব এবং কোরআনেও বলেছে—"আমি একটা প্রদীপ্ত প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছি" (সূরা নাবা)। তাহলেও বলতে হবে যে সূর্যের ওজন পৃথিবীর তুলনায় কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত যদি শুধু গ্যাস দ্বারা গঠিত হয় তাহলেও এর ওজন পৃথিবীর ওজনের চাইতে বেশী হতে পারে না। একশত মাইল ঘনত্ব বিশিষ্ট গ্যাসকে ওজন করলে তা পর্বতের অতি সামান্য একটা চুড়ার ওজনের চাইতেও কম হবে। অথচ আয়তনের দিক

দিয়ে গ্যাস লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী হবে। তাই সূর্য পৃথিবীর চাইতে ১৩ লক্ষ গুণ বড় হোক বা ৩০ লক্ষ গুণই বড় হোক না কেন Solid পৃথিবীর ওজনের চাইতে বেশী হতে পারে না। তাই মাধ্যাকর্ষণের সূত্র অনুযায়ী পৃথিবী সূর্যকে তার চতুর্দিকে ঘোরাবে—সূর্য নয়। আপনি বলেছেন, "একসের ওজনের বরফকে বাষ্পে পরিণত করে ওজন করলে তার ওজন ১ সেরই হয়।" বেশ কথা, ওজনে কমবে না সত্যি। কিন্তু বলবেন কি যখন ঐ গ্যাসকে আগুনে পোড়ান হয় তখন যা অবশিষ্ট থাকে তা সমগ্র বরফের ওজনের সমান হয়? এছাড়া আমি প্রবন্ধে বলেছি যে সূর্য-দেহের যে তাপমাত্রা সে তাপমাত্রায় কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না অর্থাৎ কোন কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্বই সেখানে নেই। আপনি বরফের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেটা প্রবন্ধের মূল চিন্তা-ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হয়ত বলতে পারেন আগুন বা গ্যাস দ্বারা সূর্য তৈরী তা কোথা থেকে আসল? এ প্রশ্নের জবাব কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারবেন না। কিরূপে হচ্ছে এ সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই। কেন হচ্ছে আমরা জানি না। আইনস্টাইন তাই বলেছেন, **"সাধারণ দহন ক্রিয়া থেকে যদি সূর্যের বিকিরণ হতো তবে অনেক যুগ আগেই সূর্য জমাট অন্ধকারে পরিণত হতো।"**

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বপক্ষে ঃ দ্বিতীয় প্রমাণে আমি বলছি—"ধরা যাক চুম্বকত্ব শক্তির প্রভাবে একটি অপরকে ঘোরাচ্ছে।" আপনি অস্বীকার করে বলেছেন "ঘূর্ণন সৃষ্টি হবার জন্য কি চুম্বকত্ব একান্ত জরুরী?" উত্তরে আমি বলব—'হ্যাঁ।' Law of Gravitation অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বাদে ঘূর্ণনের জন্য একমাত্র চুম্বকত্ব শক্তিই দায়ী। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া জড় বিশ্বে যে সমস্ত শক্তি আছে, যেমন—(১) ঘর্ষণ শক্তি (Frictional Force) (২) রাসায়নিক শক্তি (Chemical Force) (৩) সংযোজক শক্তি (Cohesive Force) (৪) স্থিতিস্থাপক শক্তি (Elastic Force)। এদের মধ্যে চুম্বকত্ব শক্তিই (Magnetic Force) সব চাইতে বেশী শক্তিশালী

ও গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত ১ হতে ৪নং শক্তিসমূহ বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি হতে সৃষ্ট। কেননা এই সমস্ত শক্তি পদার্থের পরস্পরের উপর ক্রিয়া মাত্র এবং সমস্ত পদার্থই অণু দ্বারা গঠিত। অণুগুলো আবার বিদ্যুৎ কণা দ্বারা গঠিত (Electrons and Protons are electrically charged particles)।

আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে দুটি Theory-এর উপর। (১) Law of Gravitation (২) Law of Magnetisation. অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও চুম্বকত্ব শক্তি। কোন্ থিওরীর উপর যে পৃথিবী অথবা সূর্য ঘুরছে সেটা আমরা জানি না। পৃথিবী একটা বিরাট চুম্বক। পৃথিবীর চৌম্বকত্ব শক্তিই যে মাধ্যাকর্ষণের মূলে নয় এ কথা বলাও কঠিন। কেননা এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু বছর গবেষণা করে এই মন্তব্যে আসেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বকশক্তি একই ব্যাপার কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সফলকাম হননি।

মহাবৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বকত্ব শক্তির প্রভাব বর্ণনা করেছেন তাঁর Unified field theory-তে, যাকে বলা হয় একীভূত ক্ষেত্র তথ্য। এতে বলা হয়েছে, "মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব প্রকৃতির নিয়ম পরিচালনাকারী দুইটি প্রধান শক্তি। এদের কাজের গুরুত্ব তখনি উপলব্ধি করা যাবে যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে প্রকৃতির প্রায় সমস্ত ঘটনাই এই দুই আদিম শক্তি দ্বারা সংঘটিত হতে থাকে।"[১] আমার কথার উপর গুরুত্ব না দিয়ে মহাবৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ও সূত্রকে নিয়ে চিন্তা করুন। নিশ্চয়ই তখন দেখতে পাবেন যে ঘূর্ণনের জন্য চুম্বকশক্তি দায়ী কি না?

আসুন আর দু' একটা দৃষ্টান্ত দেখে প্রমাণটির সত্যতা পরিষ্কার করি। বর্তমান বিজ্ঞান Electromagnetic Theory-এর উপরই চলেছে। যখন Electromagnetic Theory আলোচনা করি তখন Law of Gravitation হিসাবের মধ্যে ধরি না এবং এর প্রশ্নই

টীকা—১। বিশ্ব রহস্যে আইনস্টাইন—তর্জমা এম. এ. জব্বার।

আসে না। আমরা দেখেছি যে একটা কাঁসার গ্লাসের উপর একটা রূপোর টাকা রেখে ভেতরে একটা চুম্বক কাঠি ঘোরালে টাকাও ঘোরে।

Engine, Electric Fan সবই ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে। অন্যান্য পদার্থ ঘুরছে না অথচ দুটি চৌম্বকত্ব শক্তিবিশিষ্ট পদার্থ দিয়ে Engine-এর Commutator ও Armature যখন বসান হয় তখন কি করে একটা আর একটার চতুর্দিকে ঘোরে? এরূপ হাজার হাজার বর্তমান বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণ থেকেই দেখা যায় যে ঘূর্ণনের জন্য চৌম্বকত্ব শক্তিই বিশেষরূপে দায়ী। তবে এ শক্তির উপর নির্ভর করে যে পৃথিবী অথবা সূর্য ঘুরছে না এ কথাও Conclusion-এ দেখিয়েছি।

তৃতীয় প্রমাণ স্বপক্ষে: আপনি বলেছেন, "অনেক উপরে কোন একটা স্থির বস্তু আছে। তার ঠিক বরাবর নিম্নে পৃথিবী-পৃষ্ঠে একটা বিন্দু নিন। ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত কল্পনা করুন। ঐ বৃত্তের পরিধির উপর দিয়ে আপনি যতই ঘুরতে থাকুন না কেন ঐ স্থির বস্তুর উপর দূরত্ব আপনা থেকে সব সময়ই একই স্থানে থাকবে।"

আপনার এ চিন্তাধারাকে অমূলক বলছি না, তবে আপনার যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারছি না, কারণ বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারি না। আপনার কথা অনুযায়ী উপরের ঐ স্থির বস্তুকেই সূর্য মনে করলাম। এখন পৃথিবীপৃষ্ঠে ঐ কল্পিত বৃত্তের পরিধির উপর ঘুরতে থাকলাম। আপনার যুক্তি অনুযায়ী উপরের স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে। কিন্তু তাই কি হয়? প্রতি ঘণ্টায় সূর্যের স্থান পরিবর্তন দেখতে পাই। কয়েক ঘণ্টা পর দেখতে পাব একদম অন্ধকারে পড়ে গেছি। এই ত হলো আপনার নির্দেশিত ছোট বৃত্তের উপর ঘুরবার ফল। এখন বড় বৃত্ত নিয়ে একবার ঘুরে দেখি।

বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী সূর্য পৃথিবী হতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তাহলে

৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকেই ঘুরছে। অর্থাৎ এর ব্যাস ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল (সূর্যের ব্যাস না ধরেই)। তাহলে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে যে পরিধি নিয়ে ঘুরছে সে পৃথিবী হতে স্থির ধ্রুব-নক্ষত্রকে একই স্থানে দেখবার কোনই কারণ থাকতে পারে না। আমাকে যে বৃত্তের উপর ঘুরতে বলেছেন সে কাল্পনিক বৃত্তের কোটি কোটি গুণ বড় বৃত্তের উপর ঘুরেও কি ধ্রুব-নক্ষত্রকে স্থানচ্যুত দেখতে পাব না ? যদি পৃথিবী ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম। কিন্তু ঘোরে না বলেই ধ্রুব-নক্ষত্রকে স্থির দেখি তাই আপনার যুক্তি মানতে পারলাম না।

আপনার এ কথা সত্য শুধু তখনি যখন পৃথিবী আপন মেরু-দণ্ডের উপর ঘোরে। কিন্তু সূর্যের চতুর্দিকে এ পৃথিবীকে ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিন সময় লাগে ও ৬০ কোটি মাইল স্থান ঘুরে আসে। তাই সূর্যের চতুর্দিকে এত বড় কাল্পনিক বৃত্তের যে কোন স্থান ধ্রুব-নক্ষত্র হতে সমান দূরত্বে হবে এ কেমন যুক্তি ? এছাড়া ধ্রুব-নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেও পৃথিবী ঘুরছে না। আর এত বড় বৃত্তের উপর ঘুরেও ৩৬৫ দিনের মধ্যে কোন সময়ই কি ধ্রুব-নক্ষত্রকে স্থান পরিবর্তন করতে দেখতে পাব না ? পৃথিবী ঘুরছে না বলেই স্থির বস্তুগুলি স্থিরই দেখা যায়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বপক্ষে ঃ এ প্রমাণে বলেছিলাম যে, পৃথিবী এক হাজার মাইলেরও বেশী গতিতে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলও অনুরূপ গতিতে অথবা কিছু কম গতিতে ঘুরবে। এত প্রচণ্ড গতিকে অতিক্রম করে সামান্য মৃদমন্দ গতিতে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বায়ুচক্রের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ২/১ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন বায়ুকে কি করে অতিক্রম করে ?

আপনার এ প্রসঙ্গে আলোচনা Point to point হয়নি। আমি ত প্রবন্ধে বলিনি যে মানুষ বা অন্য বস্তুর পক্ষে বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা সম্ভব অথবা উচিত ছিল আর বায়ুপ্রবাহ কেন হয় সে কথাও আলোচনা করিনি। কেননা বায়ুপ্রবাহ যে Vacuum

সৃষ্টির জন্যই হচ্ছে সে ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবারে আবার বায়ুপ্রবাহ নিয়ে আপনার যুক্তির বিপক্ষে আলোচনা করছি। Vacuum হয়ে যখন বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তখন কি তার গতিবেগ ১ হাজার মাইলের বেশী হয়? Cyclone-এর Maximum speed কোন দিনই ১ হাজার মাইলকে অতিক্রম করেনি, করতে পারবে কি না সে নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজনীয়। আর যদিও হয় তাহলে আপনার যুক্তি অনুযায়ী শুধু Cyclone Period-এর অর্থাৎ Vacuum creation-এর সময়ই পৃথিবীর পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের গতিকে অতিক্রম করে স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ হতে পারে। কিন্তু বলবেন কি যে Normal Period-এও কেন ১ হাজার মাইল বেগে বায়ুমণ্ডলকে সামান্য ২/৩ মাইল বায়ুবেগ অতিক্রম করে উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়? যখন পদ্মার খরস্রোতা জল একই দিকে চলতে থাকে তখন কি জলস্রোতের মধ্য হতে অন্য স্রোত উত্থিত হয়ে উল্টোদিকে যায় ও সমগ্র স্রোতের গতি পরিবর্তন করে দেয়? তা হয় না। পৃথিবী স্থির বলেই এ Vacuum creation হয় ও বিভিন্নমুখী বায়ুপ্রবাহ সম্ভব হয়।

এবারে চলুন এরোপ্লেনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। আমি বলেছিলাম যে, এরোপ্লেনটা নিয়ে এমন একটা Stage-এ যাব যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক কম কিন্তু এমন অবস্থায় না যেখানে থেকে সূর্যের আকর্ষণে উপর দিকে উঠে যাবে। এরোপ্লেনের গতি যদি স্থির থাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কম থাকে তাহলে এরোপ্লেনটা পৃথিবীর একই গতিতে চলতে বাধ্য এমন কোন যুক্তি হতে পারে না। কেননা পৃথিবীর পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের যে তাপ তা নিশ্চয়ই উপরের বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান নয় এ কথা আপনিও স্বীকার করেছেন। যদি তাই হয় তাহলে এরোপ্লেনের গতি ও পৃথিবীর গতি কি করে সমান হয়? মহাবৈজ্ঞানিক নিউটন শূন্যস্থানকে স্থির অনন্ত এবং বাস্তব বলেই মনে করতেন। যদিও কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা তিনি

তাঁর মতবাদকে প্রমাণ করতে পারেননি তবুও ধর্মশাস্ত্র ও যুক্তি-বলেই তিনি তাঁর মতবাদে অটল থাকেন। কেননা তাঁর মতে শূন্যস্থানই প্রকৃতিতে আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান অনুপম অবস্থায় পরিচয় বহন করে।

এখন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, পৃথিবীর গতি শূন্যে অবস্থিত কোন বস্তুর গতির সমান নয়। শূন্যকে নিউটন Frame of reference ধরে নিয়ে তাঁর আবিষ্কারে সফলতা লাভ করেছেন। তাঁর এ থিওরী মিথ্যা হলে সব Relation-কেই মিথ্যা বলতে হয়।

ধরুন, একটা বলকে তার Axis-এর উপর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ১ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল স্পীডে ঘোরানো হচ্ছে। বলের উপর একটা স্থানকে লাল চিহ্নিত করা হয়েছে। ধরলাম, ঐ চিহ্নিত স্থানটি ঢাকা। এখন বলটি Axis-এর উপর ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা খুব ছোট ভারী পদার্থ উপরে কয়েক ফুট তুলে নিলাম। এর ২/১ মিনিট পর একটা কাঁচের টিউবের মধ্যে উক্ত পদার্থটি সোজাসুজি বলের উপর ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই ঐ লাল চিহ্নিত স্থানের উপর পড়বে না। যদি পড়ে তাহলে বলতে হবে Accidentally পড়েছে। এর সম্ভাবনা এত কম যে Mathematical calculation-এর বাইরে। এখন বলটি Fixed করুন। লাল চিহ্নিত স্থানটি উপরে রাখুন। এবারে সোজাসুজি পদার্থটি ছেড়ে দিলে দেখতে পাবেন ঠিক ঐ চিহ্নের উপর পড়েছে। অথবা ২/১ মিলিমিটার এদিক ওদিক হয়েছে। এবারে বলটিকে পৃথিবী মনে করুন আর ঐ ছোট পদার্থটিকে এরোপ্লেন মনে করুন।

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অনেক কিছু লিখতে হলো। সমালোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সাহিত্যিক নই তাই ভাষার মধ্যে অশ্লীলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ত্রুটি পেলে ক্ষমা চাই। জনাব নূর মোহাম্মদ ও সৈয়দ আফছার আলী সাহেবকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের কথাগুলোর উত্তর পর পরই দেব বলে আশা করি।

বিপক্ষে

—সায়েদ আফসার আহম্মদ

॥ তিন ॥

বিতর্কিকার বিষয়বস্তু ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষ। জনাব নূরল ইসলাম সাহেব শুধু সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরিয়েই ক্ষান্ত হননি, পৃথিবীকে একেবারে পেরেক মেরে যেন স্থির করে দিয়েছেন। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ তো দূরের কথা তার নিজ মেরুর উপর যেন ঘুরতে না পারে সে বন্দোবস্তও তিনি করেছেন। আমি এখানে তার যুক্তিগুলির অসারতা প্রমাণ করছি।

(১) ইসলাম সাহেবের মতে বায়বীয় পদার্থের ওজন নিতান্ত কম, তাই বায়বীয় পিণ্ড সূর্য পৃথিবী থেকে যত বড়ই হোক না কেন ওজনে পৃথিবী থেকে কম হবেই। কথাটা ঠিক নয়। কোন কঠিন বা তরল পদার্থকে উত্তাপ দিয়ে বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত করলে তার ওজন লোপ পায় না, মোটেও কমে যায় না। আসলে আয়তন বৃদ্ধি হয় তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। যেমন এক ঘনফুট পানি ফুটিয়ে যদি ১০০ ঘনফুট জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয় তবে এই বাষ্পের ওজন ঐ এক ঘনফুট পানির ওজনের সমান হবে। আয়তন বাড়বে তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব কমবে, কিন্তু ওজন ঠিক থাকবে। আর যেসব বায়বীয় পদার্থ স্বাভাবিকভাবে বায়বীয়, তাদেরও ওজন আছে।

(২) সূর্য ও পৃথিবী পরস্পরকে আকর্ষণ করছে চুম্বক শক্তির প্রভাবে নয়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কথাটা ইসলাম সাহেব হয়ত জানেন বলেই তাঁর এই দ্বিতীয় প্রমাণ ধরা যাক বলে শুরু করেছেন। আকর্ষণ শক্তি থাকতে হলে দুটোকেই চুম্বক হতে হবে নতুবা এ শক্তি হবে না কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একটি চুম্বক যে কোন লৌহ বা নিকেলের টুকরোকেই আকর্ষণ করতে পারে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণটা যে চুম্বক শক্তির প্রভাবে নয় তার প্রমাণ কাঠের আসবাবপত্র। আমরা নিজেরা বা অন্যান্য প্রাণী, চুম্বক

শক্তির কোন প্রভাবই যাদের উপর পড়ে না অথচ তারাও পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। ইসলাম সাহেবের আকর্ষণী শক্তি থাকতে হলে দুটোকে চুম্বকত্ব শক্তিহীন সূর্যকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে কিরূপে ?

(৩) অনাদিকাল থেকে ধ্রুব-নক্ষত্র একই স্থানে দৃষ্ট হচ্ছে, তাই পৃথিবী স্থির যুক্তিটা একেবারে ঠুনকো। জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ যখন আপনার ঠিক মাথার উপর তখন আপনি উত্তর দিকে সোজা এক মাইল চলে যান। উপরে চেয়ে দেখুন চাঁদ তখনও মাথার উপর। চাঁদটা কি আপনার সাথে চলে গিয়েছে ? না, আসলে চাঁদের দূরত্বের তুলনায় আপনার ১ মাইল ভ্রমণ এত অকিঞ্চিৎকর যে জন্য চাঁদ মাথার উপরেই রয়ে গেছে। ঠিক তেমনি পৃথিবী তার নিজের মেরুর বা সূর্যের চারদিকে যতই ঘুরুক তার কক্ষপথের পরিধি ধ্রুব-নক্ষত্রের দূরত্বের অনুপাতে নিতান্ত ক্ষুদ্র, আর বড় কথা পৃথিবী যেখানেই থাকুক যতই ঘুরুক, সকল সময় পৃথিবীর উত্তর মেরু ধ্রুবের দিকে নিবদ্ধ। তাই ধ্রুব-নক্ষত্র উত্তর গোলার্ধ থেকে সর্বদা একই স্থানে দেখা যায়।

দেখুন উত্তর গোলার্ধ থেকে সর্বদা দৃষ্ট আর কোন নক্ষত্র সর্বদা একই স্থানে দেখা যায় না এবং এদের অনেকেই বছরের বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি বহির্ভূত হয়। এটা পৃথিবী যে ঘুরছে তারই প্রমাণ।

(৪) পৃথিবী যেমন গাছপালা ও পশু-পাখিকে সাথে নিয়ে ঘুরছে, তেমনি বায়ুমণ্ডলকেও সাথে নিয়ে ঘুরছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কারণে আমরা যেমন এই গতিবেগ অনুধাবন করতে পারছি না, ইচ্ছামত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যে কোন দিকে চলতে পারছি ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলও গতিবেগ অনুধাবন করতে পারছে না বা এ গতিবেগের কারণে তার উপর কোন প্রক্রিয়া হচ্ছে না। তাই বাতাস যে কোন দিকে মৃদুমন্দ গতিতে বা ঝড়ের বেগে চলতে পারে।

"ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য কিন্তু শূন্যকে নিয়ে নিশ্চয় ঘুরছে না" কথাটার মানে বোঝলাম না। শূন্য বলতে যদি তিনি বায়ুমণ্ডলকে বুঝতে চান তবে নিশ্চয়ই তাকে নিয়েই ঘুরছে। আর যদি মহাশূন্যকে বোঝান তবে তাকে নিয়ে ঘোরার কথাই আসে না, কারণ পৃথিবী তার ভিতরেই ঘুরছে। আপনি যখন পুকুরে সাঁতার কাটেন তখন জলকে সাথে নিয়ে ঘুরছেন না। পাখি যখন বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায় তখন বায়ুমণ্ডলটাকে সাথে নিয়ে বেড়ায় না। এরোপ্লেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরেই থাকে আর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথেই ঘুরছে বলে তার ভেতরে এক জায়গায় ঝুলে থেকে ঢাকা হতে লাহোর যাওয়া সম্ভব নয়। তবে রকেটে করে বায়ুমণ্ডলের উপরে উঠে যদি কোন উপায়ে এক ঘণ্টা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন তবে সখটা মিটতে পারে। লাহোর অফিস আপনার পায়ের তলায় এসে যাবে আর আপনি টুক করে নেমে পড়বেন। তবে হ্যাঁ, সমান গতিতে উড়ে মাঝখানে না থেমে লাহোর থেকে ঢাকা আসার সময় থেকে ঢাকা থেকে লাহোর যাওয়ার সময় কিছুটা কম লাগবে বৈকি। এটা পৃথিবী ঘোরার একটি প্রমাণ ; বিশ্বাস না হলে কোন Avation সম্পর্কীয় Expert-কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

এক জায়গায় ইসলাম সাহেব বলেছেনঃ "হিমালয় পাহাড়ের উপরে উঠলে মানুষের ওজন কমে যায় কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম।" নিজের গায়ের উপরেই সমতল থেকে মাত্র পাঁচ মাইল উপরে যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হয় তবে নয় কোটি সাইত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্যকে সে আকর্ষণ করে ঘোরাচ্ছে কি করে ?

আর আকর্ষণ করে ঘোরানো কথাটাই ভুল, আকর্ষণ যে করে সে ঘোরায় না, আকর্ষিত জনই ঘোরে প্রাণের দায়ে। সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তা একেবারে তার বুকে এনে ফেলার জন্য আর পৃথিবীর ঘোরার গতি এমন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ের যে এই গতির দরুন সূর্য তাকে টেনে নামাতে পারছে না। গতিবেগটা একটু

কমে এলেই সূর্যের বুকে পৃথিবীর পতন অনিবার্য, আবার আরেকটু বাড়াতে পারলে সূর্যের মায়া কাটিয়ে পৃথিবী বেপাত্তা। আজকের রকেটের যুগে এ তথ্য প্রমাণিত সত্য। এক বিশেষ বেগে রকেট মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। বেগ এর থেকে বেশী হলে পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে চলে যায়।

জবাব

—লেখক

২২শে শ্রাবণ রবিবার সংখ্যায় 'বিতর্কিকা' পরিচ্ছেদে "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" প্রবন্ধের বিপক্ষের জনাব সায়েদ আফসার আহম্মদ সাহেব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আপনি যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাতেই আলোচনা করেছেন দেখে সুখী হলাম। আপনি লিখেছেন, "ইসলাম সাহেব শুধু সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরিয়েই ক্ষান্ত হননি, পৃথিবীকে একেবারে পেরেক মেরে স্থির করে দিয়েছেন।" আপনার ধারণাটা একেবারে নিখুঁত সত্য। পৃথিবীর মায়া আমি ছাড়তে পারি না। এছাড়া জ্বলন্ত সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতেও ভয় পাই। আমার এটা ভীরুতারই লক্ষণ। কিন্তু আপনার সাহস দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। পৃথিবীর মায়া যে একেবারে ছেড়ে দিলেন আর তাকে বেলুন বানিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘোরাতে থাকলেন। আপনার এ সাহস অজেয় হোক।

পৃথিবীকে পেরেক মেরে শুধু আমি আটকাইনি। আমার মত যারা ভীরু তাঁরাও বহু পূর্বে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। আগুন দেখে কার না ভয় হয়। কোটি কোটি বছর তাই অগণিত মহাপুরুষ এই পেরেককে সযত্নেই ধরে রেখেছিলেন। তবুও তাঁদের ভয় হচ্ছিল। মহাবৈজ্ঞানিক নিউটন এসে তাদের এ ভয় ছাড়ালেন ও বললেন তোমাদের কোন ভয় নেই। আল্লাহ স্বয়ং নিজেই

এ খুঁটির ব্যবস্হা করেছেন। আর এ লাটিম হয়ে ঘুরবে না। তারা জিজ্ঞেস করল কোথায় এ খুঁটি? নিউটন হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঐ পাহাড়গুলো, কথাগুলো গল্পের মত লাগছে, তাই আপনার মত চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের হয়ত বিরক্ত করছি, মাফ করবেন। তবে একবার অনুরোধ করব আমাদের ঐ মহাগ্রন্থ কোরআন খুলতে। চলুন দেখি তার মধ্যে কি লেখা আছে। **সূরা 'নবাতে' দেখেন আয়াত ৬ ও ৭**—"তবে কি আমি ভূতলকে শয্যা করি নাই এবং পর্বতসমূহকে কীলক স্বরূপ।" এই কীলকের অর্থ বোধহয় আপনার উল্লিখিত পেরেক। আপনার কথা যথার্থই হয়েছে তবে অনুসিন্ধান্তটির সামান্য একটু ত্রুটি হয়েছে এই যে পেরেকটি আমি দিইনি। আমাদের মত ভীরু লোকদেরকে নাগরদোলায় দোলনের হাত থেকে রক্ষা করতে এ কীলক স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন।

আরও লিখেছেন, "সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ তো দূরের কথা, তার নিজ মেরুদণ্ডের উপরও যেন ঘুরতে না পারে।"

এর উত্তরে আর কি বলব? যে হাঁটতে শেখে সে তার বন্ধু-বান্ধবকে খুশী করতে নিজ শরীরের উপর ভর দিয়ে নাচ দেখাবে কি করে? এতো একেবারে সোজা কথা।

গ্যালিলিও পৃথিবীকে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে যখন দেখলেন যে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দিবা-রাত্রি আসছে না তখনই আবার এক পাক দিয়ে দিলেন। সেই পাকের নাম হলো **আহ্নিক গতি**। এ পাকের ফলে পৃথিবীকে ঘণ্টায় ১০৪১ মাইল বেগে তার নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরতে হলো। একটা বস্তুর দুটি গতি হয় কি করে? এবার সূর্যের চতুর্দিকে ৬৮,৫৫০ মাইল বেগে প্রতি ঘণ্টায় ঘুরবে আবার একই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের উপর ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও বেশী গতিবেগ নিয়ে ঘুরবে। এরূপ কোন সূত্র আছে কি? রকেট ও চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরার সময় কি পাক খেতে খেতে ঘুরে আসে, না চক্রাকারেই একবার ঘুরে আসে,

কোন্‌টা ? যদি বলেন যে চন্দ্র ও রকেট নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে না এবং এদের কোন আহ্নিক গতি নেই তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কোন্ মহাসূত্রের উপর চাপাচ্ছেন ? এবারে চলুন আপনার গুরুত্ব-পূর্ণ অন্যান্য কথাগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করি।

দ্বিতীয় প্রমাণের বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন যে বায়বীয় পদার্থের ওজন কমে না, এটা ঠিক। কিন্তু জানেন তো এর ধর্ম। কোন কঠিন বা তরল পদার্থ উত্তাপ দিলে যে বায়বীয় পদার্থে হয়, তা কি ওখানেই পড়ে থাকে, না অনন্ত মহাশূন্যের দিকে যায় ? আর তখনি ঐ বায়বীয় পদার্থকে পুড়িয়ে দিলেই বা কি হয় ? যে সূর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ৪ কোটি ডিগ্রী তার মধ্যে কোন্ ধরনের বায়বীয় পদার্থ আশা করেন ?

বাস্তবকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ভুল চিরদিনই ভুল হয়ে থাকতে পারে না। একশ ঘনফুট আয়তন বিশিষ্ট একটা বেলুনের মধ্যে গ্যাস ভরে ওজন করেন। যে ওজন পাবেন ঐ ওজন বিশিষ্ট একটা Solid পাথর নিয়ে একবার তুলনা করে দেখুন যে আয়তনের দিক থেকে Solid পাথরটির তুলনায় গ্যাসের আয়তন কত লক্ষ গুণ বেশী। তাই সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের চাইতে বেশী বলেই যে পৃথিবীর ওজনের চাইতে সূর্যের ওজন বেশী হবে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। জ্বলন্ত অগ্নি ছাড়া সেখানে কোন গ্যাসই থাকতে পারে না। এই মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী সূর্য পৃথিবীকে তার চতুর্দিকে ঘোরাতে পারে না বরং পৃথিবী সূর্যকে তার চতুর্দিকে ঘোরাবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ : মনে হয় আপনি একটা লাইন ভুলে গেছেন অথবা নিবিষ্ট মনে পড়েননি। এতে পরিষ্কার লেখা আছে—"আকর্ষণ শক্তি থাকতে হলে দুটোকে চুম্বক হতে হবে অথবা চুম্বকত্বের গুণ থাকতে হবে।" শেষের লাইনেও আবার পুনরাবৃত্তি করে লিখেছি—"এখন দেখি সূর্য ও পৃথিবী দুটোই চুম্বক কি না অথবা চৌম্বকত্বের গুণ আছে কি না।" কিন্তু দুর্ভাগ্য এই অংশটুকু

বাদ দিয়েছেন বলে অপব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করি। বিশেষ করে এই চুম্বকের ব্যাপারে। তাই জানি যে একটা চুম্বক অন্য একটা চুম্বক অথবা চৌম্বকত্ব গুণ বিশিষ্ট পদার্থকে আকৃষ্ট করে। আপনি লিখেছেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা যে চুম্বকত্ব শক্তির প্রভাবে নয় তার প্রমাণ কাঠের টুকরা আসবাবপত্র……না। এর বিশদ আলোচনা দেখতে পাবেন জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের যুক্তির বিপক্ষে যে আলোচনা করেছি এতে। মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বকত্ব শক্তি যে একই জিনিস এ নিয়ে বহু গবেষণা চলেছে এবং চলবে। যে কোন জড় পদার্থের মধ্যেই সেটা কাঠ অথবা আসবাবপত্র যাই হোক না কেন, Electron ও Proton Particles আছে এ কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। এ কথাও জানেন যে এরা Charged particle। তাই দেখা যায় যে পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থের অণুই Charged। তাই এদের Attraction ও Repulsion-এর ক্ষমতা আছে। প্রতিটি জড় ও চেতন পদার্থের Central Nucleus কিভাবে Electron ও Proton দ্বারা সংঘবদ্ধ এ কথা সবাই জানে। এদের আসল কারণ কি Electromagnetic Force না? পৃথিবীর বিরাট চৌম্বকত্ব শক্তিই যে প্রতিটি পদার্থকে আটকে রেখেছে ও বিরাট Electromagnetic Field Create করেছে এ কথা কি আজ Electromagnetic Theory হতে বললে ভুল হবে? আল্লাহর কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে—

"**পৃথিবীকে আমি কি আকর্ষণকারী করি নাই জীবিত ও মৃতদিগের জন্য।**" [সূরা মোরসালাত]। এখানে জীবিত ও মৃত অর্থাৎ জড় ও চেতন।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মূলে কি রহস্য আছে সেটা আজও অনাবিষ্কৃত। হয়ত বৈজ্ঞানিকরা এ রহস্য অচিরেই উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হবেন। তাই **পৃথিবীর বুকে যা কিছু আটকে আছে জড়, চেতন সবই দুদিন পর বৈজ্ঞানিকগণ বলবে এর কারণ পৃথিবীর**

চৌম্বকত্ব শক্তি যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ কথাকে অপ্রিয় বলে রাখলাম—মাফ করবেন।

আপনি লিখেছেন, "ইসলাম সাহেবের আকর্ষণী শক্তি থাকতে হলে দুটোকেই চুম্বকত্ব শক্তিহীন সূর্যকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে কিরূপে?" আপনার এই শেষোক্ত বাক্যটি হয় ছাপার ভুল নতুবা আপনার Expression ভুল। তাই উত্তর দিতে পারলাম না।

তৃতীয় প্রমাণঃ আপনি চাঁদের তুলনা দিয়ে নক্ষত্রের যুক্তিকে ঠুনকো বলেছেন। আপনার চাঁদের উপমা দেখে হাসতে হলো। কেননা চাঁদ ও পৃথিবী দুটোই যখন ঘুরছে তখন চাঁদের যুক্তি দেখলেন কিরূপে? হাবিবুর রহমান সাহেব বলেছিলেন উপরের স্থির বস্তু লক্ষ্য করতে। তাঁর উপমা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল।

যাই হোক আপনার থিওরী প্রমাণ করতে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সুযোগ্য এক জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ যখন মাথার উপর তখন উত্তর দিকে চলতে লাগলাম। ১ মাইল পথ অতিক্রম করার পর দেখলাম চাঁদ ঠিক মাথার উপর আছে। তখন আপনার থিওরী অকাট্য প্রমাণ করে নিজের যুক্তি প্রমাণের অসারতা বুঝতে পারলাম ও আপনাকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু মন প্রবোধ মানল না। থিওরীটাকে Confirm করতে বেহায়ার মত আবার চার মাইল উত্তর দিকে হাঁটলাম। এবার উপরে তাকিয়ে দেখি চাঁদ আমার মায়া কাটিয়ে পশ্চিম দিকে অনেক দূর চলে গিয়েছে। মনে করলাম হয়ত ভুল বশতই চাঁদ সরে যাচ্ছে অথবা আমার চোখের দৃষ্টিই কিছু খারাপ হয়েছে। তাই আরও ৫ মাইল উত্তর দিকে গেলাম। এবার দেখলাম চাঁদ আর নেই। আমাকে একদম অন্ধকারে ফেলে নির্দয় হয়ে অন্যের মাথার উপর চলে গেছে। আপনার চাঁদের উপমা দেখতে গিয়ে শেষে মহাবিপদে পড়লাম। এবার আপনাকেই অনুরোধ করব পরীক্ষাটি স্বজ্ঞানে ঘরের বাইরে

এসে করতে। তখন আপনার যুক্তির অসারতা আপনি প্রমাণ করবেন এবং বলবেন যে "ধ্রুব-নক্ষত্র স্থির এবং পৃথিবীও স্থির, নইলে চাঁদের অবস্থাই হতো।"

আপনি বলেছেন, "উত্তর গোলার্ধে দৃষ্ট আর কোন নক্ষত্রই সর্বদা এক স্থানে দেখা যায় না এবং এদের অনেকেই বছরের বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি বহির্ভূত হয়। এটা পৃথিবী ঘুরছে তারই প্রমাণ।"

আপনার উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবী স্থির। কেননা অন্যান্য নক্ষত্রগুলি সবাই ঘুরছে বলেই ত স্থির পৃথিবীর দৃষ্টি বহির্ভূত হচ্ছে। আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি আর আমার সম্মুখ দিয়ে কোন গতিশীল যান চলে যায় তাহলে সেটা আমার দৃষ্টি বহির্ভূত হবে না? আর গতিশীল যান দৃষ্টি বহির্ভূত হবে বলেই কি এর অর্থ হবে যে আমি দৌড়াচ্ছি? আপনার কথায় আপনি ধরা দিয়েছেন যে পৃথিবী এবং ধ্রুব-নক্ষত্র স্থির। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে কতক্ষণ ঢেকে রাখা যায়?

চতুর্থ প্রমাণ : আপনি বলেছেন, পৃথিবী যেমন গাছপালা ও পাখিকে নিয়ে ঘুরছে তেমনি তার বায়ুমণ্ডলকেও সাথে নিয়ে ঘুরছে—হতে পারে না।

পৃথিবী এক হাজার মাইল বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে। তার বায়ুমণ্ডলও এক হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরছে একথা আপনিও স্বীকার করেছেন। এক হাজার মাইল বেগের বায়ুকে অনুভব করতে পারেন না আর সামান্য ২/১ মাইল বেগের বায়ুকে অনুভব করেন কিরূপে? একই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই ত আছেন।

পাখি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গেই ঘুরবে আপনি বলেছেন। ঠিক আছে। কিন্তু পাখিটিকে যখন বায়ুমণ্ডলের বিপরীত দিকে যেতে হয় তখন নিশ্চয়ই অশেষ পরিশ্রম করে ৯ হাজার মাইল বেগের বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করতে হয়। তাহলে তার গতি উল্টো দিকে

যেতে নিশ্চয়ই এক হাজার মাইলেরও বেশী হতে হবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কেননা খরস্রোতা নদীতে একটা নৌকা রাখলে তা জলস্রোতের সঙ্গেই চলতে থাকবে। কিন্তু যদি উল্টো দিকে আসতে হয় তাহলে স্রোতের গতির চাইতে বেশী গতি নৌকার হতে হবে। এটা ত বাস্তব প্রমাণ। যখন এটাই সত্য তখন বলতে হবে যে অনুরূপভাবে পাখিকেও উল্টো দিকে এক হাজার মাইলেরও বেশী গতিবেগ নিয়ে চলতে হয়। তাই কি? পাখির গতি কি উল্টো দিকে এক হাজার মাইলের বেশী? উল্টো দিকে চলবার জন্য যদি প্রতিটি জীবজন্তুকে এক হাজার মাইলের বেশী গতি নিয়ে চলতে হতো তাহলে এ ধরায় বাস করা সম্ভব হতো না। একটু চিন্তা করলেই এ ভুলের অবসান হয়। আমি বলছিলাম, "ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য। কিন্তু শূন্যকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না।" আপনি বলেছেন, "কথাটার মানে বুঝলাম না।" শূন্যস্থান স্থির, অনন্ত এবং বাস্তব। শূন্যে অবস্থিত কোন বস্তুর গতি পৃথিবীর গতির সমান নয়। তাই বৈজ্ঞানিক নিউটন শূন্যকে Frame of reference ধরে নিয়ে তার আবিষ্কারে সফলতা লাভ করেন। তাঁর এ থিওরী মিথ্যা হলে সব Relation-কেই মিথ্যা বলতে হয়। এইজন্য উপরে অবস্থিত এরোপ্লেনের গতি পৃথিবীর নিকটতম বায়ুমণ্ডলের গতির সমান নয়। তাই এই বায়ুবেগের সঙ্গে এরোপ্লেন চলতে পারে না।

আপনি লিখেছেন, "আপনি যখন পুকুরে সাঁতার কাটেন তখন জলকে সাথে নিয়ে ঘোরেন না। পাখি যখন বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায় তখন বায়ুমণ্ডলটাকেও সাথে নিয়ে বেড়ায় না।" ঠিক এর পরের অনুচ্ছেদেই লিখেছেন, "এরোপ্লেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরই থাকে। আর বায়ুমণ্ডল পৃথিরীর সাথেই ঘুরছে বলে তার ভেতরে এক জায়গায় ঝুলে থেকে ঢাকা—লাহোর যাওয়া সম্ভব নয়।"

এবারে নিশ্চয়ই জবাব দেবেন যে জলে সাঁতার কাটলে জল

নিয়ে ঘোরা যায় না। পাখি বায়ুমণ্ডল নিয়ে ঘোরে না তবে এরোপ্লেনকে বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘুরালেন কি করে? আমি ত আপনার কথাই বলেছি যে, "ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য কিন্তু শূন্যকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না।" এর ব্যাখ্যাও করেছি যে উপরের বায়ুমণ্ডলের গতি নিচের বায়ুমণ্ডলের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না। আপনার কথায় আপনি Contradict করেছেন এবং Confused হয়ে গেছেন। চলুন Practical প্রমাণে আপনার Confusion মুছে দিই। পুকুরের স্থির জলে প্রমাণ করেছেন। এবার চলুন নদীর স্রোতে।

ছোট বেলায় অঙ্ক করেছি। মনে আছে যে স্রোতের গতি ঘণ্টায় ১০ মাইল আর নৌকার গতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল হলে নৌকাটি স্রোতের অনুকূলে যাবে ঘণ্টায় ১৫+১০=২৫ মাইল। আর প্রতিকূলে যাবে ১৫−১০=৫ মাইল। তাহলে দেখা যায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করতে অনুকূলে সময় লাগে ১ ঘণ্টা আর প্রতিকূলে ৫ ঘণ্টা। এখান থেকে দেখা যায় যে একই নৌকা নিয়ে প্রতিকূলে যেতে সময় অনেক বেশী লাগে। শুধু তাই না, স্রোতের উল্টোদিকে যেতে হলে নৌকার গতি স্রোতের গতির চেয়ে বেশী হতে হবে। এবারে আসুন ঢাকা ও লাহোরের পথ দেখি। ঢাকা লাহোর হতে ১ হাজার মাইল দূরে। যেহেতু পৃথিবী (আপনাদের মতানুযায়ী) ১ হাজার মাইল বেগে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরছে, সেহেতু তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের গতিও ১ হাজার মাইল হবে। কোন এরোপ্লেনের গতি যদি ঘণ্টায় ৫০০ মাইল হয় তবে লাহোর হতে ঢাকা পেঁছাতে ২ ঘণ্টা লাগবে (বায়ুর গতি ঢাকা ও লাহোর Common)। কিন্তু ঢাকা হতে লাহোর যেতে ১ হাজার মাইলের বেশী গতিসম্পন্ন এরোপ্লেনের দরকার। যদি তার গতি ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল হয় (১৫০০−১০০০=৫০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়) তবেই ২ ঘণ্টায় লাহোর পেঁছাবে। তাহলে দেখা যায় যে লাহোর হতে ঢাকার পথে এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৫০০ মাইল,

ঢাকা হতে লাহোর পৌঁছাতে সেই এরোপ্লেনের গতির দরকার ১৫০০ মাইল। অথচ ঢাকা হতে লাহোর ও লাহোর হতে ঢাকার এরোপ্লেনের গতি একই। স্রোতের উল্টোদিকে যেতে হলে যেমন নৌকার গতি বেশী দরকার সেরূপ বায়ুমণ্ডলের গতির বিরুদ্ধে যেতে হলেও এরোপ্লেনের গতি বায়ুমণ্ডলের গতির চেয়ে বেশী হতে হবে নতুবা সারাজীবন সাধনা করেও উল্টোদিকে যাবার কল্পনা কল্পনাতেই থেকে যাবে। নৌকা নিয়ে একবার এ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার দিলে যেমন সাঁতারের গতিবেগ কমে যায় তেমনি পৃথিবী ঘুরলেও যে ইথার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার বিপরীত দিকে আলোকতরঙ্গ পাঠালে তার গতিবেগও কম হওয়ার কথা। আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল এবং আপন কক্ষে পৃথিবীর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ২০ মাইল (বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী)। অতএব ইথার তরঙ্গের অনুকূলে আলোকতরঙ্গ পাঠালে তার গতিবেগ হওয়া উচিত ১,৮৬,৩০৪ মাইল এবং প্রতিকূলে পাঠালে এর গতিবেগ হওয়া উচিত ১,৮৬,২৬৪ মাইল। কিন্তু মাইকেলসন ও মলি ২ জন বৈজ্ঞানিক নির্ভুলভাবে 'ইনটারফেরোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে আলোকতরঙ্গ ইথারের অনুকূলে পাঠিয়েও দেখতে পেলেন এর কোনই পার্থক্য হয় না। অথচ উক্ত যন্ত্রে প্রতি সেকেন্ডে ১ মাইলের অতি সূক্ষ্মতম অংশও নির্ভুলভাবে ধরা পড়ার কথা। কিন্তু অতি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা সমাধান করেও দেখা গেল যে আলোকরশ্মি যে দিকেই পাঠান হোক না কেন তার গতিবেগের কোন তারতম্য হয় না। এই পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণকে মহাবিপদে পড়তে হল। তাদের সামনে তখন দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমত, ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অথচ এই ইথার তরঙ্গের সাহায্যে বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব অতি সহজভাবে বোধগম্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যদি ইথারকে রাখতে হয় তবে কোপার্নিকাসের

সর্বজনমান্য মতবাদকে পরিত্যাগ করে বলতে হয় পৃথিবী স্থির; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পদার্থবিদ পৃথিবীকে স্থির এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ, চুম্বক প্রবাহ আলোক প্রবাহের মাধ্যমে বা বাহক ইথারকে বাদ দিতে রাজী হননি। এই অতীব জটিল সমস্যাটি প্রায় ২০ বছর বিজ্ঞান-জগৎকে দুভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই টিকল না। অবশেষে সন্দেহ হতে লাগল মাইকেলসন মলি ভুল করেননি ত। তাঁদের যন্ত্রপাতি ঠিক ছিল ত? তাঁরা আবার পরীক্ষা করে দেখলেন এবং অনেকেই পরীক্ষা করলেন। কিন্তু না কোথাও ভুল হয়নি। আলোর গতিবেগের পরিবর্তন হয় না।

অর্থাৎ **'ইথার সমুদ্রে পৃথিবীর কোন গতিবেগ নেই'**।[১]

আপনি লিখেছেন, 'সমান গতিতে উড়ে মাঝখানে না থেমে লাহোর থেকে ঢাকা আসার সময় ঢাকা থেকে লাহোর যাবার সময় কিছুটা কম লাগবে বই কি?"

আপনার কথা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। ঢাকা হতে লাহোর যাবার সময় লাগার অর্থ পৃথিবী পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। আমার মতবাদকে ত মানলেনই না, যে গ্যালিলিও-এর থিওরীকে এতক্ষণ আঁকড়ে ধরে প্রমাণ করলেন তাঁকেও উল্টো করে দিয়েছেন। আর দেবার কথাও বটে। কেননা গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র সবই ত পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। শুধু পৃথিবীর বেলায় এসেই ত যত তালগোল।

'কিছুটা সময় কম লাগবে বই কি' এ কথায় বোঝা যায় যে আপনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের সুযোগ পাননি। আমি কিন্তু ভাই একবার নয় অনেকবারই এ প্রমাণ করেছি। Mathematically

---

টীকা ১।—বিশ্বরহস্যে আইনস্টাইন। তর্জমা অধ্যাপক এম. এ. জব্বার পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬।

কিছুটা কম সময় লাগার কথা নয়, এতে যে পার্থক্য দেখতে পাবেন সেটা সামান্য নয়। বিরাট পার্থক্য।

যেহেতু ঢাকা ও লাহোরের পথে সময়ের এরূপ বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে না এবং একই এরোপ্লেন উভয় দিকে একই গতিতে চলছে সেহেতু নিঃসন্দেহে বলতে পারেন বায়ুমণ্ডলের যে গতি ধরে হিসাব করলাম সে গতি মোটেই নেই অর্থাৎ পৃথিবী ঘোরে না।

আমি বলেছিলাম, হিমালয় পাহাড়ের উপর উঠলে মানুষের ওজন কমে যায়। আপনি অস্বীকার করেছেন। আপনি কি তবে বলতে চান যে উপর দিকে গেলে ওজন ঠিকই থাকে বা বেড়ে যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্তী পদার্থের ওজন যে কেন্দ্র হতে দূরবর্তী পদার্থের ওজনের চেয়ে বেশী এ কথা অস্বীকার করার অর্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেই অস্বীকার করা অথবা মাধ্যাকর্ষণের সূত্র না জানা। প্রমাণ করতে গিয়ে যদি আসল সূত্রকে হারিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু পাঠকবৃন্দ খুশী হবেন না। শেষের লাইনের উত্তর সূর্যের ওজন কম বলে।

প্রবন্ধের শেষের দিকে রকেটের উদাহরণ দিয়েছেন দেখে খুশী হলাম। রকেট ঘণ্টায় ১৮০০ হতে ২৬০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। পৃথিবীর গতিবেগ কিন্তু ঘণ্টায় ১ হাজার মাইলেরও বেশী। দুটোই যখন গতিশীল তখন রকেট কি করে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে? এ সমস্যারও সমাধান করেননি। দুটো লাটিম ঘুরিয়ে একই জায়গায় ছেড়ে দিন। যখন দুটোর ঘর্ষণ লাগবে তখন এর ফলাফল দেখতে পাবেন। তখনি এ কথা পরিষ্কার হবে যে পৃথিবী ঘোরে কি না।

পক্ষে

—মৌলানা আবু জাফর সিদ্দিকী

প্রথম প্রমাণ ঃ এই গোল পৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০ মাইল এবং ২৪ ঘণ্টায় আপন আবর্তন পথে একবার আবর্তন করে। এখন ৩৬৫ দিনে সে ৯১,২৫,০১০ মাইল অতিক্রম করবে। এতদ্ব্যতীত বেশী পথ অতিক্রম করা তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক গোলাকার বস্তুর পরিধির পরিমাণ ভিন্ন বেশী পথ অতিক্রম করতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন যে, সূর্য পৃথিবী হতে ৯,২৭,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে যে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে তার পরিমাণ ৬০ কোটি মাইল। কিন্তু যে পৃথিবী বছরে মাত্র ৯১,২৫,০১০ মাইল অতিক্রম করে তা কিরূপে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী গতিশীল হওয়া অমূলক।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ কোন গোলাকার বস্তু গড়িয়ে দিলে কেবল একদিকে গড়িয়ে যায়। এক সময় দু' দিকে তার গড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ হিসাব যদি পৃথিবী স্বীয় আহ্নিক গতিতে পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে তার বার্ষিক গতিতে ঋতু পরিবর্তন উত্তর হতে দক্ষিণ দিক এবং দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে পরিভ্রমণ করা অসম্ভব। অতএব পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ মত।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানে পৃথিবীর গতি প্রত্যেক ঘণ্টায় হাজার মাইল। তাহলে প্রত্যেক মিনিটে এর গতি ১৬ পূর্ণ তিন ভাগের দুই মাইল হবে। আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষিত হয়েছে যে, একটি তোপ উপরে ছুঁড়লে এক মিনিটের মধ্যে তার গোলা যে স্থান হতে ছোঁড়া হয়েছিল প্রায় সেই স্থানেই পড়ে। যদি প্রতি মিনিটে তার

গতি ১৬ পূর্ণ ৩ ভাগের ২ মাইল হত তবে উক্ত গোলাটি ১৬ পূর্ণ ৩ ভাগের ২ মাইল দূরে পতিত হত। পক্ষান্তরে, দেখা যায় যে এরূপ হয় না। এতেই বোঝা যায় যে পৃথিবী ঘোরে না।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ কেউ কেউ বলেছেন, মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবী ঘোরে। এখন জানার বিষয় যে, মাধ্যাকর্ষণের সাথে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে। তবে প্রথমে দেখব যে পৃথিবী যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন মাধ্যাকর্ষণকে সঙ্গে নিয়ে যায় কি? না মাধ্যাকর্ষণ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে? তাই পৃথিবীকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়—এর কোন্‌টি সত্য হবে? হ্যাঁ, যদি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার বেলায় মাধ্যাকর্ষণকে সাথে নিয়ে যায় এমন হয় তবে মাধ্যাকর্ষণ সে স্হলে হবে Follower এবং পৃথিবী হবে following things।

হ্যাঁ, যখন প্রমাণ হল যে মাধ্যাকর্ষণটি অনুসরণকারী তখন এর প্রভাবে পৃথিবী কেমন করে ঘুরবে? তা সম্ভব নয়। কাজেই মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবী ঘোরে না। অনুরূপভাবে বায়ুকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এর প্রভাবে পৃথিবী ঘুরছে না। কারণ অনুসরণকারীর প্রভাব অনুসরণকৃত জিনিসের প্রভাবে সমান নয় বরং কম হবে। কাজেই কম প্রভাবশালী বস্তু বেশী প্রভাবযুক্ত বস্তুকে ঘোরাতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণ ঃ একটি তোপ উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে বৈজ্ঞানিকদের মতে এক মিনিটে তার গোলা যে স্হান হতে ছোঁড়া হয়েছিল সে স্হানে এসে পড়ে। যদি কেউ বলেন যে যেরূপ পৃথিবী দ্রুত গমন করেছে সেরূপ তদুপরি বায়ুস্তরও দ্রুত গমন করে থাকে। কাজেই গোলাটি বাতাসের প্রবল শক্তিতে পৃথিবীর সাথে সাথে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তদুত্তরে বলতে পারি যে, একজন লোক একটি তীর পৃথিবীর গতিপথের দিকে আর একটি তীর তার বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করলে কিন্তু দুটো তীর উভয় দিকে সমান দূরে পড়বে। যদি বায়ুস্তরের শক্তিতে তোপের গোলা ১৬ পূণ

৩ ভাগের ২ মাইল গতিশীল পৃথিবীর সাথে সাথে আকৃষ্ট হয় তবে বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত তীরটির গতি প্রথমটি হতে অতি কম বা সামান্য হবে। অতএব পৃথিবীর ও বায়ুস্তরের উপরোক্ত গতি যুক্তিবিরুদ্ধ মত।

ষষ্ঠ প্রমাণঃ স্থল অপেক্ষা পানি কয়েক গুণ বেশী। একটি পাত্রে পানি রেখে তা ঘোরালে উক্ত পানি সম্পূর্ণ পড়ে যায়। এক্ষেত্রে পৃথিবী তার আবর্তন পথে আবর্তন করলে বা ঘোরালে অবশ্য সমুদ্রের পানি সূর্যমার্গে পড়ে যেত। কিন্তু তা ত হয় না ; তাই বোঝা গেল পৃথিবী গতিশীল নয়।

পক্ষে

—মোহাম্মদ আবদুল হাই ছুলফী

এক ঃ বৈজ্ঞানিক মতে সূর্য পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবী প্রতি এক বছরে সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসে, যার ফলে শীত ও গরম এবং দিন ও রাত ছোট বড় হয়ে থাকে। যদি পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি থাকত তাহলে ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে একই অবস্থায়, বিশেষ করে ধ্রুবতারাকে একই স্থানে দেখা যেত না। কারণ আট হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতির ১২ ঘণ্টার গতিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরে বিপরীত দিকে অনেক দূরে সরে যেতো। ধ্রুবতারাও একদম ঠিক থাকে না। তাহলে ধরা যায় পৃথিবী ১লা জানুয়ারি হতে ৩০শে জুনের মধ্যে ছ' মাসে সূর্যকে কেন্দ্র করে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে সূর্যের বিপরীত দিকে ১লা জানুয়ারির স্থান হতে সোজা-সুজি আঠার কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে চলে যাবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে আট হাজার মাইলের পরিবর্তনে যে সপ্তর্ষি-

মণ্ডলের পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে কি সাড়ে আঠার কোটি মাইলের পরিবর্তনে কিছুতেই পরিবর্তিত দেখা যাবে না? সাড়ে আঠার কোটি মাইল দূরে পৃথিবী স্থানান্তরিত হলে শুধু সপ্তর্ষি-মণ্ডল কেন, ধ্রুবতারাকেও অবশ্যই স্থানান্তরিত বা পরিবর্তিত দেখা যাবে। কিন্তু তা হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে বার্ষিক গতি ও আহ্নিক গতি বলে কোন গতিই নেই। কিন্তু সূর্যের গতি অবশ্যই আছে।

দুই ঃ পৃথিবীর মাটি, পানি, বায়ু ও অগ্নি এই চারটি পদার্থ যথাক্রমে নিচে-উপরে সজ্জিত। পৃথিবী বা মাটির তুলনায় পানি হাল্কা, সেজন্য পানিতে মাটি ছুঁড়লে ডুবে যায় এবং বায়ুপূর্ণ কোন পাত্র পানির নিচে রাখলে বায়ু পানির চেয়ে হাল্কা হওয়ায় উক্ত পাত্র ভেসে ওঠে। বায়ুর চেয়ে অগ্নি উপরের দিকে গতিশীল হয়ে থাকে। উল্লিখিত বিষয় হতে বোঝা যায় মাটি বা পৃথিবীর সাথে অগ্নির পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধ নেই।

সুতরাং সূর্য পৃথিবীকে তার দিকে টানতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণের মতে সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণী শক্তি দ্বারা টানছে কিন্তু অনেক দূরে থাকায় নিকটে না এসেই ঘুরছে। কাজেই বোঝা গেল যে, পৃথিবী ঘোরে না বরং সূর্যই ঘুরছে। কারণ পৃথিবী না ঘুরলেও সূর্যের আলোকেই ঘুরতে হবে, নতুবা দিন-রাত্রি সৃষ্টি হতে পারে না।

তিন ঃ বৈজ্ঞানিকগণের প্রমাণ ও মতানুসারে পৃথিবী বার্ষিক গতিতে সূর্যের চতুর্দিক দিয়ে বছরে একবার ঘুরে আসে। সূর্যের নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরবর্তী কক্ষপথে পৃথিবী সারা বছরে (৯,৩০,০০,০০০ × ২ × ৩ = ৫৫,৮০,০০,০০০) পঞ্চান্ন কোটি আশি লক্ষ মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করে। এক্ষণে দেখা যায় পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় বার্ষিক গতির কক্ষপথে ষাট হাজার (৬০,০০০) মাইলের বেশী গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্লাস ভরা পানিসহ গ্লাসকে ঘোরালে যেমন গ্লাসের সাথে পানি ঘোরে না তেমনি

পৃথিবীর সাথে বায়ুমণ্ডলও ঘুরবে না। কাজেই দেখা যায় বায়ু কখনও পশ্চিম থেকে কখনও পূর্ব থেকে মৃদুমন্দ গতিতে আবার কখনও অতি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যদি পৃথিবীর গতির সাথে বায়ুমণ্ডলেরও গতি থাকত তাহলে নানা দিক হতে নানা ধরনের বায়ু প্রবাহিত হতে পারত না। পৃথিবী তার বার্ষিক গতিতে যেখানে ঘণ্টায় ষাট হাজার মাইলেরও বেশী বেগে চলছে, সে অবস্থায় কোন এরোপ্লেন পৃথিবী হতে উপরে উঠে কোন গন্তব্য পথে যদি এক ঘণ্টা কাল উড়তে থাকে তাহলে উক্ত এরোপ্লেনটি তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো ত দূরের কথা পুনরায় পৃথিবীতেই নামতে পারবে না। কারণ এরোপ্লেনটি ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল বেগে চললেও প্রায় দশ হাজার মাইল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পৃথিবী এক ঘণ্টায় বার্ষিক গতিতে এরোপ্লেনটি ছেড়ে পঞ্চাশ হাজার মাইলেরও বেশী দূরে চলে যাবে। কিন্তু এরূপ হয় না। কাজেই বোঝা যায় পৃথিবীর বার্ষিক গতি নেই। বার্ষিক গতি না থাকলে আহ্নিক গতির স্বার্থকতা নেই, কাজেই প্রমাণিত হল যে পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে।

চার ঃ বৈজ্ঞানিকগণের মত ও প্রমাণ যে পৃথিবীর বেড় পঁচিশ হাজার মাইল এবং পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে থাকে। তাহলে দেখা যায় পৃথিবী ১ ঘণ্টায় পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ১ হাজার মাইলেরও বেশী গতিতে ঘুরছে। ধরা যাক, পাকিস্তান থেকে আরব দেশ তিন হাজার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এমতাবস্থায় একটি এরোপ্লেন ঘণ্টায় পাঁচশত মাইল বেগে আরব দেশ অভিমুখে যাত্রা করলে তিন হাজার মাইল দূরের আরব দেশে মাত্র ২ ঘণ্টায় পৌঁছাবে। কেননা এরোপ্লেনটি ২ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল অতিক্রম করে পশ্চিমে যাবে এবং পৃথিবী তার নিজস্ব গতিতে ২ ঘণ্টায় দু হাজার মাইল অগ্রসর হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। শুধু তাই নয়, উক্ত গতিতে এরোপ্লেনটি আরব দেশ হতে পূর্ব দিকে পাকিস্তান

অভিমুখে যাত্রা করলে পাকিস্তানে পৌঁছানো ত দূরের কথা আরব দেশেই নামতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর গতি ১ হাজার মাইল। অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল এরোপ্লেন দ্রুত গতিশীল পৃথিবীর সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু আমরা দেখি আরব দেশ থেকে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে আরব দেশে যাতায়াত কালে সময়ের কোন তারতম্য হয় না। কাজেই প্রমাণিত হল পৃথিবী স্থির আছে।

পাঁচঃ ধরে নিলাম পৃথিবীর গতির সাথে এরোপ্লেনের ও অন্যান্য কিছুর গতির তারতম্য হয়ে থাকে। কারণ এরোপ্লেনও পৃথিবীর সাথে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধ রয়েছে। আচ্ছা এত দ্রুত ও গতিশীল এরোপ্লেনের সম্বন্ধ পৃথিবীর সাথে থাকলেও এরোপ্লেনের বাইরে খোলা জায়গায় কেউই বসে থাকতে পারে না কেন? যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমায় পাঁচশত মাইল বেগের এরোপ্লেনের উপরে বসে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘণ্টায় ষাট হাজার মাইল বেগে চলেছে তার উপরিস্থিত বৃক্ষলতা পৃথিবীর উপর হেলে পড়ে না কেন? যদি পৃথিবীর বার্ষিক বা আহ্নিক গতি থাকত তাহলে পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সঠিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। সবকিছু ভূপাতিত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। আমরা এরূপ দেখতে পাই না। কাজেই প্রমাণিত হল পৃথিবী ঘোরে না। বরং সূর্যই ঘোরে।

ছয়ঃ ঋতু পরিবর্তনে বা আবহাওয়া পরিবর্তনে আমাদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়ে থাকে। কফ, জ্বর ও অন্যান্য অসুখ হয়ে থাকে। পৃথিবী বার্ষিক গতিতে একদিনে ১৬ লক্ষ মাইলের মত স্থানান্তরিত হচ্ছে অথচ এ পরিবর্তন আমরা আঁচ করতে পারি না। কাজেই বোঝা গেল পৃথিবী স্থির, নিশ্চয় স্থির।

[এই প্রবন্ধের উপর যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের সম্পূর্ণ লেখাগুলো পাঠকবৃন্দের নিকট তুলে ধরতে পারলাম না। কেননা যতগুলো লেখা আছে সেগুলো বই-এ স্থান দিলে পুস্তকের

কলেবরই শুধু বৃদ্ধি হয় না, বেশ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার সংস্থান করা আমার পক্ষে কঠিন। তাই যেসব বন্ধু-বান্ধব আমার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা করেছিলেন—তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।]

—লেখক

পরিশিষ্ট

কোন কৃতিত্ব নেবার উদ্দেশ্যে নয়, বৈজ্ঞানিকরূপে নিজেকে তুলে ধরার মানসে নয়—চিন্তাবিদরূপে আখ্যায়িত হতে নয়—সত্যের বাণী সবার সম্মুখে তুলে ধরার অদম্য ইচ্ছা এবং সাহস নিয়েই লিখতে বসেছিলাম আমার এ ক্ষুদ্র বইখানি। উপহাস, বিদ্রূপ, হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করেও চেয়েছি আমার মনের কথা ও কোরআনের চিরসত্য বাণী জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে। কতটুকু সফল হয়েছি জানি না। মিথ্যা যেমন রাতারাতি লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী প্রচারিত হয়ে পড়ে, সত্য তা হয় না। সত্যকে প্রকাশ করতে যেমন প্রয়োজন সময়, তেমনি প্রয়োজন ধৈর্য ও ঈমান। যারা সত্যকে অবলম্বন করতে চায় তাদেরও চাই তেমনি দৃঢ় মনোবল। তাই সত্যকে প্রকাশ করা এবং সত্যকে অবলম্বন করার মাঝে রয়েছে এক বিরাট সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধন করতে আমি বিনীতভাবে কামনা করি সত্যের সাধক, বিশ্বাসী মানুষ এবং পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী আমার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাইবোনদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও সহানুভূতি। আমি জানি এবং মনে প্রাণেই বিশ্বাস করি যে এই কয়েক শ্রেণীর পবিত্র আত্মাকে প্রবঞ্চনা দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারেনি। তারা সত্যের পথে জেহাদ করেছে। সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মিথ্যার মূলোৎপাটন করে মিথ্যাবাদীকে সাগর সলিলে সমাধি দিয়েছে।

আল্লাহ ! আজ তোমার কাছে আমি শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়েই শুকুর আদায় করছি এজন্য যে ধিকিধিকি হলেও তোমার সত্যের আলোক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মিথ্যাবাদীদের অন্তরে এ আলোক দিচ্ছে মৃদু মৃদু আঘাত যার ফলে অনেকেই অস্থির হয়ে চোখে সরষে ফুল দেখছে। যারা প্রথমে এ সত্যের কথা শুনে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠত আজ তাদের অনেকেই অবসন্ন। যাদের কানে তোমার এ মহাবাণী কঠিন আঘাত দিত তাদের কান আজ প্রায় বধির। যাতনা যেমন বাড়ছে চেতনাও তেমনি ফিরছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে দিগদিগন্তে তোমার এ বাণী ছড়িয়ে দেওয়া। তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আর আমার জীবনও ধন্য হোক। আমিন।

—লেখক

NOT THE EARTH
BUT
THE SUN MOVES

(The English Translation of the article was published in "The Young Pakistan" a renowned Weekly English Paper which runs about seventy countries of the world.')

Mohammad Nural Islam, B. Sc,
B. C. S. Engg-Telecom.
[Bangladesh]

NOT THE EARTH
BUT
THE SUN MOVES
[FIRST PART—SCIENTIFIC PROOFS]

Thoughts and Theories are not constant and are found to fluctuate in different times. It has been observed that the scientists came to different conclusions of the same subject in different ages. So it is seen that the real and gospel truth sometimes are turned into a great unreality which is followed by the millions. But the unreality must be exposed. Truth must come out and should not be suppressed as it is the order of the nature. If falsehood prevails for a longer period, it replaces truth and reality is suppressed. The waves of falsehood generally upset the genius and saints even and do not give scope to expose truth. Centuries after centuries passed with this wrong theory, "THE EARTH MOVES ROUND THE SUN." I do not know how far the theory given by the Italian Scientist MR. GALILEO is true regarding relationship of the Sun and the Earth. I like to put the following Proofs to show **"Not The Earth But The Sun Moves."**

First Proof : "Every particle in the universe attracts every other particle with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two."

i. e. $F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2} \left\{ F = G. \frac{m_1 m_2}{d^2} \right\}$ (Newton)

The substance which has got greater weight will attract the smaller one or cause it to revolve around it. If the distance between the two is great, there will be less attractive force. In this case the substance of the greater weight, though it cannot attract the smaller one revolve closer to it, but due to its influence will cause the smaller one revolve around it. Now let us think over the Sun and the Earth. The Earth is completely a solid-body, composed of solid, liquid and gases. So its weight is very high. On the other hand, the Sun is not better than a fire globe. It may be composed of some gaseous substances. If it is treated as a complete fire globe we can say undoubtedly that its weight is nothing as fire has got no weight at all. Secondly, if it is treated to be composed of gaseous substances still we can say that its weight is nothing in comparison with the weight of the Earth. Because the weight of the gaseous substance is so less that though it occupies greater space, its weight is considered negligible. Moreover, the internal temperature of the Sun is so high (Central temp. 4 crores degree centigrade and surface temperature 12000°C according to scientists) that no substance either in a state of liquid or solid can remain. So what ever might be the volume of the Sun, its weight can never be greater than that of the solid Earth. It is, therefore, absolutely impossible on the part of the Sun to cause the Earth revolve around it, when the weight of the Sun is less than that of the Earth. On the contrary, the Earth, due to its heavy weight, causes the Sun moves around it.

We are not considering the distance between the Sun and the Earth because surely one causes revolution to the other which is perceived by all. The distance between the two is in right proportion, hence, it cannot attract one closer to the other but due to the greater attractive force ; one causes the other to move arround it. When there will be no right proportion of distance between the two, one will attract the other closer to it which will cause a disaster and will bring about a complete destruction. When the Sun will be displaced from its own orbit, there will be no difference of distance and the Earth by dint of its attractive force will bring the Sun nearer to it.

Second Proof : Let us presume that either the Sun or the Earth attracts the other by the influence of magnetic force. This force also depends upon the masses and the distance of the two magnets. As for example, if two magnets are placed side by side, one will attract the other. The greater magnet will attract the smaller one but if the distance is far greater, though there is the magnetic force, yet influence cannot be perceived. To have the magnetic force the two substances must be magnet or should possess magnetic properties, otherwise there will be no attractive force. For instance, if a piece of wood is brought near a magnet there will be no magnetic force. Now let us think whether the Earth and the Sun are two magnets or possess magnetic properties.

We see that the Earth is a great magnet. Thousands and thousands of magnetic substances are there in the Earth. If a piece of iron is left for some days

in the Earth, it will acquire magnetic properties. The compass is found to direct its needle towards North and South. Moreover from many other practical proofs we see that the Earth is a great magnet.

What about the Sun? Is it a great magnet like the Earth? The Sun is made of fire and is called a fire globe. Everybody admits it. For the time being we are not considering whether it contains any other melted substances and also do not feel the necessity to analyse it. Because Allah Himself declared in 'Sura Naba' in the Holy Quran—"And I have created one illuminating lamp." As the genius of human beings goes together with the Word of Allah, there cannot be any doubt to say that the Sun is nothing but a powerful fire globe. Since this is true, it can be, said undoubtedly that the Sun has got no magnetic properties because the fire kills the magnetic property. This is the practical proof of the modern science. If the Sun does not have the magnetic properties it cannot at all causes the Earth revolve around it. So it is impossible that the Earth moves around the Sun.

Third Proof : I have been observing and listening from my boyhood that the 'Pole Star' and other some stars in the sky are found to remain in a fixed position. Had it been the fact that the Earth moves, these fixed stars would have been invisible but that is not happening. Teachers used to teach me in my boyhood that if a man confined his sight in the steamer or a boat he won't feel that his boat or steamer is in motion. Similarly we cannot feel the movements of the Earth. I admitted it those days but not now.

Because if a man keeps his sight fixed at a certain centre from the steamer or a boat. Surely he will find that this particular centre is going far away and ultimately that will disappear. If the Earth would have been moving these fixed stars were found to be disappearing in a considerable margin of time, say in an age or in a century. But time and experience are teaching us that these stars. particularly 'Pole Star' are stationary. The relative distance between the two remain constant only when the two substances move in the same speed or the two remain stationary. The relative distance between the two remain constant only when the two substances move the same speed or the two remain stationary. Here the 'Pole Star' is stationary unless the Earth is stationary, one would become invisible to the other. As this change never happens in any season of the year it can be said undoubtedly that the Earth is not at all moving.

Fourth Proof : According to the scientific measurement the circumference of the Earth was found twenty five thousand miles. It comes back to its original position after revolving on its own orbit in 24 hours. From this it can be calculated that its speed is more than one thousand miles per hour. Let us suppose that the Earth is moving with the said speed from West to East accompained by the surrounding atmosphere. The Earth which is moving with such an enormous speed, its surrounding atmosphere will also move simultaneously with the same speed or with a less speed upwards in the same direction. But we find the atmosphere to move in different directions in

different times. Not only that we even find it is moving from East to West i.e. in opposite direction. The surrounding atmosphere which has got a velocity of more than one thousand miles can never be surpassed by a wind having a velocity of 2 or 3 miles per hour only. Unless the Earth is stationary this sort of atmospheric movement would have been impossible.

Fifth Proof : Let us suppose that the Earth is moving really but definitely it is not moving with the vacuum. If it be so, we can fly up with an aeroplane, stop there for one hour controlling speed and land again, we will see that we have come back to the original place of start. For example, let us start from Dhaka in an aeroplane, reach upto a certain height where there is little influence of gravitational force. If the aeroplane controlls the speed, rests for an hour in the sky then during this time, the Earth will move one thousand miles from West to East.

If the aeroplane after one hour's rest in vacuum lands direct, it must not touch Dhaka. It should have been Lahore in a place at a distance of one thousand miles away from Dhaka in Western direction. But such a thing never happened. Of course one question may be raised that due to the gravitational force and enormous speed of the Earth there must be some velocity of the atmosphere which will causes the aeroplane moves from West to East. But at what extent and at what velocity ? If a man rides up the Himalayas, he will lose his weight due to less influence of gravitation. This is a concrete and experimental proof. The atmospheric pressure in the upper layer is less so the

velocity in the upper atmosphere is not the same as the velocity of the atmosphere on the Earth's surface. Let us suppose that the upper atmosphere is revolving at a velocity of one thousand miles per hour where as the aeroplane is moving at a velocity of five hundred miles per hour i.e. the aeroplane is lagging behind by 500 miles per hour. If the distance between Dhaka to Lahore is one thousand miles, then the time required by the aeroplane to touch Lahore is two hours only (when downward speed is not calculated. If calculated accurately then there will be little difference of time). But it is not happening. So it is clearly understood that the Earth is not at all moving.

Not only that one mystery is here that the same aeroplane with the same velocity is used for the journey from Dhaka to Lahore and Lahore to Dhaka and equal time is covered in both directions. Had there been the revolution of the Earth the aeroplane needed to go from Dhaka to Lahore i.e. in opposite direction of the Earth's revolution with a speed of more than one thousand miles per hour, otherwise an ordinary aeroplane which is generally used having 2 to 3 hundred miles speed could by no means overcome the speed of the Earth. But everybody knows that no special aeroplane is used for journey from Dhaka to Lahore or an extra speed is given to overcome the Earth's speed and found to cover equal time for both-way journeys which surely proves that the Earth has got no velocity at all. That is to say it is ever stationary.

Sixth Proof : If two guns of the same capacity are

fired at a time from the same place in Eastern and Western directions, the bullet when fallen on Earth is found to cover the equal distance in both directions. Had there been the motion of the Earth definitely the distance covered in Western direction would be greater than that of Eastern. As no difference of distance of observed it can be concluded that the Earth has got no motion at all. If a gun is fired upward the bullet is found to fall on the point of start. This also confirms that the Earth is at rest.

Seventh Proof : $\frac{3}{4}$th parts of the Earth is water and rest i.e. $\frac{1}{4}$th parts is land. The Earth, which is surrounded by water $\frac{3}{4}$th of its volume, if revolves on its own axis at a speed of one thousand miles per hour,there cannot be the existence of this part of the land. This ought to have been inundated in such a cruel manner that all creation were washed out leaving nothing behind. Not only that, the surrounded water would scatter away to occupy space in great vacuum with the revolution of the Earth. There would have been no existence of ocean also. Over and above, had the Earth revolved from West to East there could not be ocean currents flowing in different directions and these currents were supposed to be seen only in the direction i. e. West to East. At this does not occur it can be said undoubtedly that the Earth is stationary.

Eighth Proof : For a complete revolution around the Sun, the Earth is to overcome about 50 crore miles and it takes 365 days. So it is found on calculation that its speed is approximately 68,500 miles per hour where is the Moon completes its course of 18

lakh miles around the Earth in a year i.e. its speed is approximately 2,285 miles per hour. It is clear to everybody, those who understand only the numerical figures of sum that the Moon having a velocity of 2,285 miles per hour only cannot revolve or follow the Earth which has got a velocity of 68,500 miles per hour It is therefore, absurd and absolutely impossible that the Moon revolves around the Earth unless it is fixed. A motor car having velocity of ten miles per hour cannot overcome a train having a velocity of sixty miles per hour. No brain can think of such an impossibility.

As per science as well as verses of the Holy Quran it has been accepted that the Moon is revolving around the Earth. When it is true, it is also true that the Earth is fixed otherwise the Moon cannot complete its course having less velocity than that of the Earth.

NOT THE EARTH
BUT
THE SUN MOVES
[SECOND PART—QURANIC PROOFS]

The Holy Qur'an can settle the great questions of life and the universe. Basing my arguments on the Qur'an, I should like to declare most emphatically that the theory of Galileo about the Sun and the Earth is wrong. Of course, what he has said about the other planets and stars is partially true. The verses of the Qur'an are the words of Allah —and so they are holy and true. Those who have faith in Allah not to speak of the Muslims—will not disbelieve the words of the Qur'an. I do not think that there is any man with some wisdom who will disbelieve the words of the Qur'an, which were revealed about fourteen hundred years ago and not a single word of which has been proved false. There has been no change in the words of the Qur'an, no Edition or alteration. Even the non-muslim scholars did not deem it necessary to change a single word in the Qur'an. So why should a wise man disbelieve the Qur'an ? And where is the ground for doing so ? The Qur'an is neither fanciful poetry of a poet, nor a theory of a scientist, nor the ravings of a madcap, nor the work of a novelist, nor the personal view of a greatman, nor the advice of a sage. The verses of the Qur'an are those holy words of the omnipotent, omniscient, merciful Allah which in rhythm and rhyme, in

language and ideas, wisdom and devotion, in philosophy and science, in commands and injunctions are a complete code of conduct for men and Jinns. So who will disbelieve it ? (Nauzubillah). It is in complete faith that I quote from the Qur'an to show the relation between the Earth and the Sun.

Sura Ya-Sin : Sec—3

(36 : Verses—38, 39 & 40)

38. "And the Sun
Runs its course
For a period determind
For it that is
The decree of (Him)
The Exaulted in Might,
The all knowing."

39. "And the Moon. –
We have measured for the
Mansions (to traverse)
Till she returns
Like the old (and withered)
Lower part of a date stalk."

40. "It is not permitted
To the Sun to catch up
The Moon, nor can
The Night overstrip the Day,
Each (Just) swims along
In (its own) orbit
(According to law)

It is clear from the verse 38 quoted above that the Sun has a fixed orbit round which according to the

decree of Allah it has always been moving since its creation. It has never deviated from its course, it will never do except by the will of Allah. Millions of years have passed but the law has not changed. No ancient history records any divergence from it. This fact makes it clear that the Sun is not fixed.

It is clear from the verse 39 that there are 'mansions' fixed for Moon's orbit around which it has always been moving, leaving one 'mansion' and entering into another.

Allah has clearly explained the revolution of the Moon with the help of a beautiful simile. Both the Sun and the Moon are revolving. As the night does not overstrip the day and the day does not enter the darkness of the night, so the Sun and the Moon never collide and cause havoc. What a wonderful scheme of creation !

Sura Zumar

(39 : Verse—5)

"He created the heavens
And the Earth
In true proportions,
He makes the night
Overlap the day and the day
Overlap that night,
He has subjected
The Sun and the Moon
(To His law)
Each one follows a course
For a time appointed,

Is not He the Exaulted
In power– He who forgives
Again and Again ?"

Can't it be declared unequivocally from the above verse that the Sun and the Moon, determined by the exquisite creative skill of the great creator, are revolving for a definite period and causing change in the night and the day ? When the Moon appears with her shining beauty, the Sun goes out of our sight and when the splendid Sun makes his appearance, the Moon dims away or disappears from our view. Neither the Sun nor the Moon is fixed –they are moving at His will. Everything is obeying the commands of Allah.

Sura Shams

(91 : Verses—1 & 2)

1. "By the Sun
   And his (glorious) splendour."
2. "By the Moon
   As She follows him."

In reference to the greatness of His creation the Almighty Allah asks man to ponder the Sun and his rays and He clearly indicates that Moon is following the wonderful creation—the Sun, we know from the verses of the Qur'an and the theory of the scientists that the Moon is revolving around its orbit according to a skilfully determined rule. If this be true, then it is also undoubtedly true that the Sun is moving around its orbit according to a definite plan. Otherwise how could the Moon follow the Sun ? If the Sun

is fixed the question of the Moon's following does not arise at all. One is said to follow another when the former obeys the order of the latter or imitates its activities, If I run and some one follows me he will also have to run. If I standstill he will also do the same. When agreeing to the Qur'an and the opinion of the scientists we have admitted that the Moon is moving, we are bound to admit that unless the Sun moves, it is pointless to say that the Moon follows it. So there can be no doubt that the Sun is moving.

Sura Rahman

(55—5, Verse-5)

'The Sun and the Moon
Follow courses (exactly) completed."

We can understand from this verse that the Sun and the Moon are working in a way that causes change in the night and the day, and man by observing this change can calculate days, months and years. Moreover, we see with our physical eyes that the Sun and the Moon rise and set, so in no way can we understand it as being stationary.

Sura Lokman

(31 : Verse—29)

Seest thou not that
God merges night into day
And He merges day into night
That He has subjected the Sun
And the moon (to His law)
Each running its course

For a term appointed ; and
That God is well aquinted
With all that ye do ?

Sura Naalh

(16 : Verse – 12)

"And He has made subject to you
The night and the day ;
The sun and the moon ;
And the stars in subjection
By His command ; verily
In these are signs
For men who are wise."

Sura Ra'd

(13 : Verse-16)

"God is He who raised
The Heavens without any pillars
That ye can see is firmly
Established on the Throne
(of Authority) ;
He has subjected the Sun
And the Moon (to His law) !
Each one runs (its course)
For a term appointed.
He doth regulate all affairs ;
Explaining the signs in detail,
That ye may believe with certainty
In the meetting with your Lord."

Now we see from the different verses of the Qur'an quoted above that the Sun is not fixed but is always moving on its orbit without rest.

Let us again turn to the Qur'an to see the position of the Earth.

Sura Nahal [16 : 15]

(Sec.: 2, Verse – 15)
"And He has set up
On the Earth mountains
Standing firm, lest it should
Shake with you ; and rivers
And roads : That ye
May guide yourself."

One sees here that God has established the heavy mountains on the Earth so that it may not shake. When it cannot even shake, is not the theory that the Earth moves round the Sun on an orbit of about 60 crore miles, entirely baseless, erroneous an unreasonable ? So it is established from 'Sura Yasin', 'Sura Zumar', 'Sura Ra'd' that the Sun is moving on its orbit and we have seen from 'Sura Nahal' that the mountains have saved the Earth from moving.

I am reproducing here the statement given by the great Prophet, Hazrat Mohammad (peace be upon him) regarding the mystery of the origin of the Earth in order to justify the explanation furnished by me above. From the statement of Sahabi Anha, the Prophet said, "when Allah created the Earth is started trembling tremendously which made it unsuitable for living for men and Jinns. So Allah created hills

and mountains and set up these on the Earth. Immediately it stopded trembling became calm and quiet and got rest and stable."

From one verse only as quoted above there might be still some doubt, so I would like to extract more valuable verses from the Holy Qur'an for confirmation of the above fact and quoted below for the readers to explain.

Sura Mumin

(23 : Verse—64)
"It is God who has
Made for you the Earth
As a resting place,
And the sky as a canopy."

Sura Fatir

(35 : Vrese—41)
"It is God who sustains
The Heavens and the Earth,
Lest they cease (to function) ;
And if they should fail,
There is none—not one
That can sustain them there after
Verily He is most Forbearing,
Oft—Forgiving."

Sura Room

(30 : Verse—25)
"And among His signs is this
That Heaven and Earth
Stand by His command."

The above quoted verses clearly state that the Earth and the sky are at permanent rest. If they deviate from their fixed places no power on Earth can sustain them except Allah

In Sura 'Mumin' God Himself declared the Earth to be a resting place. But the scientists accepted the theory that the Earth is moving with enormous speed of two prominent rotations namely—daily rotation and yearly rotation. Due to the daily rotation it revolves on its own axis at a velocity of one thousand forty one miles per hour and due to its second rotation i. e. yearly rotation, the Earth moves round the Sun at a speed of sixty eight thousand and five hundred miles per hour. I like to request the readers to think whether resting (as shown in the said verses) of a body means resting with two tremendous velocities or resting shall mean standstill, calm and quiet with no velocity ?

'Sura Room' quoted above proves my above statement and emphatically states that the Heaven and the Earth are fixed and they are at standstill.

One more valuable verse from 'Sura Ibrahim' verse 33 is quoted below for my friends to think over deeply.

Sura Namal

(27 : Verse—61)

Who has made the Earth
Firm to live in ; Made
Rivers in its midst ; set

There on mountains immovable :
And made a separating bar
Between the two bodies
of flowing water ?
Can there be another God
Besides God ? Nay most
of them know not.

Sura Ibrahim

(14 : Verse—33)

' And He has made for you
The Sun and the Moon
As moving elements."

It may not be incorrect to point out here that you mean "We with this Earth." on which we live. Then it can be said that the Sun and the Moon have been engaged for moving around this Earth i.e. clearly it is understood that the Sun and the Moon are revolving around the Earth.

The great scientist Mr. Galileo came to a right conclusion that the Moon is revolving around the Earth but in the case of the Sun he made an anomaly. He reversed the process and made the Earth revolving around the Sun. In order to get rid of this great mistake I with my little knowledge started to think deeply on the verse of the Holy Qur'an and explained those before the learned people. And it is without any shadow of doubt that their sense of reason will induce them to belive that **"Not the Earth but the Sun Moves."**

Note : After publishing the theory in the News-papers a complete book entitling—'NOT THE EARTH BUT THE SUN MOVES'—came out since 1968. In this book more important verses from the Holy Quran—Bible—Vedic—Zindavesta etc. have been added & included Geography & other chapter's also to learn vividly regarding the fact. Eighth Edition of the book is running since 1968. Curious readers are requested to collect books from libraries of Bangladesh—(Published by Shahitya Kutir, Bogra) & West Begal (Published by Mullick Brothers, 55, College Street—Calcutta-73).

Note ; A Complete book entitling—

'NOT THE EARTH BUT THE SUN MOVES'

Came out in the year 1968. Now 8th edition is running. In this book important chapters have been included along with comments in favour and against from religious talents and scientists from different corners of the world. Infavour of this theory important verses have been added from the Holy Bible, Vedic, Zindabesta, Hadith etc. only few such verses are shown here for those who have not gone through the book and not well acquinted with Bengali language.

THE HOLY BIBLE

1. "The world also stands fast. It will never deviate." [CHRONICLES—16/30]

2. "The Earth is permanently established. It will not move." [PSALMS—93/1,96/10 and 104/5]

3. "One generation goes another comes but the Earth stands fast forever." [ECCLESIASTES 1/4—5]

4. "Your faithfulness runs for generation after generation and will steadily stand as the Earth which is permanently at rest."

VEDIC

1. "We surrender to the almighty Soul (creator) —by whose Command—"Sky and Earth rest permanently and do not move from their own places."

[RIK-VEDA]

The Earth is fixed

2. "Sabita made this Earth fixed by different devices (like hills and mountains) and sustains the Sky without pillars so that it moves not."

[RIK VEDA 10/149—1]

3. "He, The Indra by his own power sustains Earth and Sky so that they deviate not."

[RIK-VEDA 10/89—4]

4. "The Sky is immovable, the Earth is immovable and these mountains are also immovable."

[RIK-VEDA 10/173—4]

The above quoted verses are exactly similar to those of the Holy Quran. Please go through the verses of SURA—ROOM, SURA FATER—, SURA LOKMAN,—SURA AMBIA as shown before. We find no difference even in words. Only three important words—SKY EARTH and MOUNTAINS have been dealt with repeatedly and shown that they

are at rest, immovable and permanently standing fast in their own places. Under no circumstances this position is altered. Mountains having been set up on the Earth just as heavy pegs—it stands immovable. All religious books have given the same evidence in similar languages. This process is also scientific. Hazrat Mahammad (Sm.), the greatest scientist and lattest prophet has also given his logical and scientific proofs through this valuable verses and discarded the wrong theories and made an end to unscientific and imaginary thoughts given by so called thinkers regarding revolution of the Earth.

Let us notice, how the VEDA has shown the stability of the Earth and the mountains and their relationship through admirable similes.

5. "Just as our fathers these mountains are standing fast for ages together and are firmly fixed. The inner significance of their creation is ful-filled. By no means they move from their own places."

[RIK-VEDA—94/12]

The Earth would not have stood fast if the hills and mountains had deviated from their places and all would have been unbalanced. Within a moment it might have caused a great disester making this Earth unsuitable for the habitation of any living beings. It has been stated many times in the HOLY QURAN.

As the father shelters his sons, the hills and mountains protect the creations from ruins and destructions overcomming all the obstructions and troubles. Thus saving the Earth from trembling, revolving, running

and displacing. As a result creatures of this world are existing safely.

The Earth is the centre of this universe

The Sun, the Moon and all the plannets are moving on their own orbits centering this Earth. Every plannets due to the gravitational force of the Earth are attracted towards it. The beautiful similee of the VEDA—shown below is its evidence.

(Pointing the Sun it states) :

O ! The Sun, having a large volume and sharp shinning you move between the Sky and the Earth. The Earth seems to your mother and you are as your concurred son. That mother embrases (attracts) you towards her by devotion."

[RIK-VEDA—volume-2 4/2-3]

To have such important verses we must not have any doubt that the Sun is moving centering this earth.

Revolution of the Sun and the Moon

In the previous chapters of the QURAN, HADITH, THE BIBLE–ZINDAVESTA, we have noticed that the Sun and the Moon are moving incessantly in their own orbits since their creation. In running on their paths. They have no rest got no idleness no difference of time for any day. Their revolutions cause day and night and not due to daily rotation of the Earth. The 'VEDA'—verses. which came out about four thousand years ago present us the same evidence and proves the reality of latter God-gifted holy books.

Also gives a lesson to the philosophers, scientist and religious saints of the ages.

Let us see, how nicely furnished the verses of this old religious book regarding the movement of the Sun and the Moon.

1. "O । The travelling the Sun and the Moon of the Sky. You living in the Sky deeply understand how to praise Him and follow His commands."

[RIK-VEDA—10/92-12]

Revolution of the Sun and the Moon

2. "O, The Indraw । You have nicely arranged a path in the Sky for the Moon on which it runs. When the circular path is obstructed by BITRA—then the Sky father of all (plannets) sustains the orbit by your commands."

[RIK-VEDA 2ND PART—10/138-6]

Rising and Setting of the Sun

1 "The Sun, father of the rays exists at a greater altitude in the Sky. **It rises in the East and sets in the West** having wonderful sharp coloured rays. Being decorated with magnificient water dress it accumulates water desired by living creations"

[SUM-VEDA-SANGHITA 9/1847]

2. "This Moving Sun adorned with attractive colours rises first in the East and running on its orbit in the Sky sets in the West."

[SUM-VEDA-SANGHITA CHAPTER 11/1376]

3. "When the beautiful coloured Sun sets in the West, the saints even fail to understand where it

hides itself. Then you, the Indraw orders it to rise in the East." [RIK-VEDA—94/12]

Change of Seasons

The following verses of the VEDA – proves clearly that the change of season is due to the yearly movement of the Sun and not due to movement of the Earth around the Sun.

1. "The 'BISNU'—(The Sun) rans on his own path in the Sky. His first step starts from a fixed point which is beyond our knowledge and steps down in three ways such as :

(a) From equinox to summer solstice.

(b) From summer solstice to equinox.

(c) From equinox to winter solstice.

In this way completes his orbit around the Earth."
[SAM-VEDA-SANGHITA 5/1669-70 8th CHAPTER]

These verses are exactly similar to the HOLY QUARN as shown in previous chapters.

Readers are requested to go through the whole book—"NOT THE EARTH BUT THE SUN MOVES"—and come to a final conclusion to make an end of the wrong theory—'The Earth moves around the Sun'. N. ISLAM (Writer.)

ZINDABESTA

"When the Earth was trembling like a fever attacked one,—He then founded hills and mountains on it. Immediately it became calm and quite and got full rest." [FIRST CHAPTER—VERSE No.—34]

HADITH

Hazrat Mohammad said :

1. "I am telling with the promise of the creater 'Allah'– The Earth and Sky stand fast by His command." [BUKHARI SHARIF.]
2nd Part
HADITH No. 114/117

2. He also said,

"When the Earth was created it started trembling vigorously resulting unsuitable for living creation. Then the creator set up hills and mountains next day. Soon it stopped trembling and got rest permanently in its own place."

MISKAT SHARIF
HADITH No. 1288

THE END